আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার উনসপ্ততিতম গ্রন্থ

মহাশ্বেতা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্ত্তিক—১৩২৮
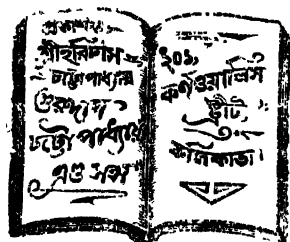
প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকা

বাঙ্গলার

সতী মায়েদের

করে

আমার

মহাশ্বেতাকে

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার-প্রণীত

—অভিনব উপন্যাস—

মায়ের প্রসাদ

অতি সুখপাঠ্য, সরল প্রাঞ্জল

ভাষায় লিখিত। বাঁধাই মূল্য ৷৷০

মহাশ্বেতা

১

"হাঁ রে, তুই কি চিরকাল ছেলেমানুষ থাক্‌বি?"

"কেন পিসিমা, কি করিচি?"

"বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করিচিস কেন?"

"ঝগড়া করিচি? আমি? কখ্‌খনো না; মিছে কথা!"

"বৌমা তবে সমস্ত দিন কাঁদচে কেন? আহা, বেচারি সবে কাল এসেচে,—আসতে না আসতে তাকে কাঁদাতে আরম্ভ করলি?"

"কাঁদচে? কেন কাঁদচে তা' কি তুমি জিগ্‌গেস করে দেখেচ? সে কি বলেচে—আমি কাঁদিয়েচি? আমি তার সঙ্গে কতাও কই নি?"

পিসিমা গালে হাত দিয়া একটা অব্যক্ত ধ্বনি সহকারে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন; সহসা তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কতাই বা না কইবি কেন? ভালমানুষের মেয়ে তোর বৌ হয়ে' কি এমন অপরাধ করেচে যে, তুই তার সঙ্গে কতা কইবি না? তাই বটে!

সেই জন্যেই বাছা সমস্ত দিন চোখ ছলছল্ করে বেড়াচ্চে বটে! আচ্ছা, তোদের কি হয়েচে বল ত?"

"হবে আবার কি? কিচ্ছুই হয় নি ত!"

"তুই কি মনে করিস, আমি কিছুই বুঝি না? কালো বৌ বলে' মনে ধরে নি বুঝি; আচ্ছা, তুই বা এমন কি সোন্দর যে, বৌকে কালো বলে ঘেন্না করবি? তোর মাও ত রূপসী বিদ্যেধরী ছিল না;—তবে তোর এত বাড়াবাড়ি কিসের জন্যে বল্ ত? গেরস্তর ঘরের ছেলে,—গেরস্তর ঘরের মতনই বৌ হয়েছে। গেরস্ত-ঘরে শিকেয় তোলা বৌ হলে চল্‌বে কেন? তাকে সংসারের কাযকর্ম্ম কর্‌তে হবে ত?"

পিসিমা তাহার অন্তরের নিগূঢ়তম স্থানের পরম গোপনীয় কথাটি ধরিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া, মর্ম্মস্থানে আঘাত পাইয়া, বিনোদলাল হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। তাহার চোখে জল আসিল; কিন্তু সে জল সে পড়িতে দিল না;—জোর করিয়া, ক্রোধকেই প্রাধান্য দিয়া, উদ্গত অশ্রু সংযত করিয়া, সে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আমি কালো, সোন্দর কাউকেই চাই নে। আমি যেমন ছিলুম, বেশ ছিলুম; কেন তোমরা আমার বিয়ে দিলে?"

"বিয়ে দোব না? ব্যাটা ছেলে, চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌বি? বিয়ে কি তুই একলাই করেচিস? আর কেউ কি কখনও বিয়ে করে নি, না, কালো বৌ কেবল তোরই একলার হয়েচে—আর কারুর হয় নি?"

"দেখ পিসিমা, তোমরা আমাকে আর অমন কোরে জ্বালাতন কোরো না। যার জ্বালা সেই বোঝে—তোমাদের কি ? বেশী জ্বালাতন কোর্‌লে আর আমাকে দেখ্‌তে পাবে না—আমার ভরসা ছেড়ে দাও।"

পিসিমা দেখিলেন, স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রের দুঃখ বড় সামান্য নহে। তিনি অনেকটা নরম হইয়া বলিলেন, "ছিঃ, বাবা, অমন কর্‌তে আছে ? বৌমার এতে দোষ কি ? কালোই যদি একটু হয়ে থাকে, তা' বলে' কি তাকে ফেলে দিতে হবে ? ঘরের বৌকে ত ত্যাগ করা যায় না—তাতে যে আমাদের নিন্দে হবে। আর, বৌমা কালো বটে, কিন্তু অমন গুণের বৌ পাওয়া বড় ভাগ্যির কথা। তোর বড় ভাগ্যি, তাই তুই অমন বৌ পেয়েছিস। কালোর ভেতর কত গুণ, তা, তুই যদি দু'দিন ঘর করিস, তা' হলেই বুঝ্‌তে পারবি।"

"তোমাদের বৌ কালোই হোক্, আর বিদ্যেধরীই হোক্—যেমনই হোক্—ও তোমাদেরই থাক। আমার বোয়ে কায নেই। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। আমি এত দিন যেমন ছিলুম, এখনও তেমনি থাক্‌ব। মনে কর্‌ব, আমার মোটে বিয়েই হয় নি।"

"আচ্ছা, কেমন না তুই বৌ নিয়ে ঘর করিস, তা' আমি দেখ্‌চি।" এই বলিয়া পিসিমা নিজের কাযে চলিয়া গেলেন। বিনোদও রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাহিরের দিকে গমন করিল।

বিনোদের পিতা বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় উচ্চপদস্থ রাজ-

কর্ম্মচারী—সবজজ। সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া এবং অপর কয়েকটি গুণে তিনি উপরওয়ালার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই সকল কারণের সমবায়ে তাঁহার শনৈঃ শনৈঃ পদোন্নতি ঘটিয়াছে। এখন তিনি মাসিক ৮০০ টাকা বেতন পান।

বৎসর দুই হইল, বিধুভূষণের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। উপযুক্ত পুত্র ও একটি শিশু কন্যা রাখিয়া সাধ্বী প্রতিভা দেবী পতির কোলে মাথা রাখিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানেও কিন্তু বিধুভূষণের সংসারে গৃহিণীর অভাব হয় নাই। পিতার জীবদ্দশায় দশম বর্ষ বয়সে বিধবা হইয়া, বিন্ধ্যবাসিনী পিত্রালয়ে আসিয়া,মাতৃহীন শিশু ভ্রাতাটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া,তাহার মাতৃস্থানীয়া হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পিতাও শিশু পুত্রের লালন-পালনের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, অতিশয় সোয়াস্তি লাভ করিলেন। সেই দিন হইতে বিন্ধ্যবাসিনী পিতার সংসারে, এবং পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতার সংসারেও, গৃহিণীর পদ অধিকার করিয়া আছেন। দিদির স্নেহ-যত্নে লালিত বিধুভূষণ দিদিকেই মাতৃতুল্য সম্মান করিয়া থাকেন। স্বামীর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা ননন্দার মতের ও আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহস প্রতিভা দেবীরও ছিল না।

এক বৎসর পরে কালাশৌচ অন্তে বিনোদের বিবাহ হয়। সে তখন এম-এ পড়িতেছিল। পঠদ্দশায় পুত্রের বিবাহ দিতে বিধুভূষণের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী সে কথা শুনিলেন না; ভ্রাতাকে আদেশ করিলেন, "এইবার বিনুর বিয়ে

দে! বাড়ীতে বৌ না থাক্‌লে বাড়ীর শ্রী থাকে না।" বড়দি'র আদেশে বিধুভূষণকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রের বিবাহে সম্মত হইতে হইল। খুব বড় ঘরেই বিনোদের বিবাহ হইল; কিন্তু নববধূর রং তেমন ফর্সা ছিল না। বিধুভূষণ কন্যাটিকে সুলক্ষণা দেখিয়াই, তাহাকে পুত্রবধূ রূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। বধূর রং ময়লা বলিয়া পিসিমা প্রথমে একটু খুঁত খুঁত করিয়াছিলেন; কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিয়া, এবং বিবাহের পর বধূ যে কয়দিন ছিল সেই কয়দিনে বধূর মধুর ব্যবহারে অচিরে তাহার পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং মনে মনে ও প্রকাশ্যে ভ্রাতার নির্ব্বাচন-শক্তির প্রশংসাও করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল বৌ বলিয়া বিনোদলাল কিছুতেই সুলোচনাকে পছন্দ করিতে পারে নাই।

২

সমস্ত দিন গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, সন্ধ্যার একটুখানি পূর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনী কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়াছেন; তাই কাপড় কাচিয়া আসিয়া, মালাগাছটি এবং হরিনামের ঝুলিটী লইয়া, তাঁহার নিভৃত কক্ষে দরজার পার্শ্বে সবেমাত্র জপ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে, উচ্চকণ্ঠে, "পিসিমা,—পিসিমা কোথায়" বলিতে বলিতে বিনোদলাল ঝড়ের মত সহসা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, বিন্ধ্যবাসিনীর প্রায় গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এ-সব কি শুন্‌তে পাচ্ছি, পিসিমা?" পিসিমা চমকিয়া উঠিয়া, মালা-

শুদ্ধ হরিনামের ঝুলিটি বুকের উপর আঁকড়াইয়া ধরিয়া, দেহখানি হেলাইয়া, ভ্রাতুষ্পুত্রের ও তাঁহার মধ্যকার ব্যবধান যথাসম্ভব বর্দ্ধিত করিয়া, আড়ষ্ট ভাবে বলিলেন, "ওরে ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে,— সর, সর; আমি মালা কর্‌চি।" বিনোদ চমকিয়া এক হাত পিছাইয়া গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসিমা তখনই উঠিয়া পড়িলেন; এবং মালাগাছটি কপালে ঠেকাইয়া, ঝুলির ভিতরে পুরিয়া, ঝুলিটা আবার কপালে ঠেকাইয়া, দেয়ালের গায়ে হুকে আটকাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "কি কথা শুনেছিস?" বিনোদ কাঁদো কাঁদো সুরে কহিল, "বড় ভয়ানক কথা!"

তখন যদিও সন্ধ্যা হয় নাই, তথাপি, পিসিমার দক্ষিণদ্বারী একতলের কক্ষে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে না পারায়, ঘরের মধ্যে যথেষ্ট আলোক ছিল না। বিশেষতঃ, বসিয়া ছিলেন বলিয়া, পিসিমা প্রথমে দণ্ডায়মান ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাহার কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্ন হইয়া মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সে সরল, সদাপ্রফুল্ল, হাসি-হাসি মুখ আজ বিষণ্ণ। গলার স্বরও যেন বিষাদজড়িত। তখন পিসিমা আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "আজ এমন সময় হঠাৎ বাড়ী এলি যে?" "থাক্‌তে পারলুম না।" "এমন কি কথা শুনে এসেচিস?" "সে বড় বিশ্রী কথা; তুমি কি কিছুই শোন নি পিসিমা?" "কই, তুই ত এখনো কিছুই বললি না, কেমন কোরে শুন্‌ব?" "আর কারুর কাছে শোন নি?" "না, তুইই বল না।" "আমার বড় লজ্জা কর্‌চে যে!"

"এমন কি কথা, যা' আমার কাছে বল্‌তে তোর লজ্জা কর্‌চে ?" "তোমাকে এইবার ছোঁব ?" "ছোঁ।" বিনোদ তখন পিসিমার আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া, চুপি চুপি বলিল, "বাবা না কি আবার বিয়ে কর্‌বেন ?"

পিসিমা এবার যথার্থই বিস্মিত, বিচলিত, উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "কে বল্‌লে তোকে এ কথা ?" "আমার এক বন্ধু—সিঙ্গীদের সত্য কল্‌কাতার বাসায় চিঠি লিখেছে। সেই চিঠি পেয়েই আমি ছুটে চলে এসেচি।" "কই, আমি ত কোন কথা শুনি নি! তা' তুই এত ভাবছিস কেন ? ভয় পাবার এতে কি আছে ? কুলীন বামুণের ছেলে—একটার জায়গায় দুটো বিয়ে করলেই বা—তা'তে ত কোন হানি নেই! কুলীন বামুণের ঘরে এমন ত কত হচ্চে। আর, ও ত একটা বৌ থাকৃতে আর একটা বিয়ে করে' তার গলায় সতীন গছিয়ে দিচ্চে না ত। আজ দু'বছর হ'ল তোর মা মরেচে, ও যে এতদিন আবার বিয়ে করে নি, এইতেই ত ওর সুখ্যেত কর্‌তে হয়!" "বাবা যাকে বিয়ে কর্‌তে চাচ্চেন, তা শুন্‌লে তুমি এ কথা বল্‌তে পার্‌তে না।" "কাকে ?" "কাকে আবার! সেই হারাধন বাবুর বোনকে!" "হারাধন উকীল ? তার বোন ত বিধবা!" "তবে আর বল্‌ছি কি! নইলে কি এমন অসময়ে পড়াশুনা ফেলে কল্‌কেতা থেকে ছুটে আসি ?"

পিসিমা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; কিছুক্ষণ ধরিয়া তিনি আর একটীও কথা কহিতে পারিলেন না। একটু থামিয়া

বলিলেন, "এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না; বিয়ে বন্ধ কর্‌তেই হবে। আমাদের বংশে এমন কাজ কখনই হতে পারে না। তুই এখন কাকেও কিছু বলিস নি। বিধু কাছারী থেকে আসুক, আমি এর বিহিত কচ্চি। তুই এখন হাত পা ধুয়ে একটু জলটল খা। ও বৌমা, বিনোদ এসেচে যে! ভজাকে ডেকে ওর হাত পা ধোবার জল দিতে বল। আর, তুমি ওর জলখাবার যোগাড় করে দাও।"

পিসিমার উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ শুনিয়া, একটী কক্ষ হইতে একটী অবগুণ্ঠিতা কিশোরী, এবং অপর একটী কক্ষ হইতে একটী বালিকা বাহির হইয়া আসিল। বালিকা বিনোদকে দেখিয়াই, ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "দাদা কখন এলে? আজ কি শনিবার? না,—আজ ত শনিবার নয়, আজ যে বুধবার। তবে কি তোমার কলেজের ছুটী হয়েছে? কিসের ছুটী? আমার জন্যে কি এনেছ দাদা? আর বৌ-দি'র জন্যে?" পিসিমা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "ওলো কুসি, থাম। দেখচিস না, তোর দাদা এইমাত্র কল্‌কেতা থেকে আস্‌ছে। দাঁড়া, একটু জিরুগ, হাত পা ধুয়ে একটু জলটল খাগ, তারপর কথা হবে' খন।" "তবে আমি ভজাকে ডেকে দিইগে—" বলিয়া বালিকা নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

৩

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বিধুভূষণ কাছারী হইতে ফিরিয়া, জল-যোগান্তে খাস কামরায় বিশ্রামার্থ তামাক সেবনে প্রবৃত্ত হইলে, বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া কহিলেন, "আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে।"

ছোট ভাই এবং বিশেষ করিয়া তাহার সংসারটির প্রতি বিন্ধ্যবাসিনীর কতখানি মমতা, তাহা বিধুভূষণের অগোচর ছিল না। এবং স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃত বড় দিদি যে তামাসা করিয়া কাশী যাইতে চাহিতেছেন, বড় দিদির কণ্ঠস্বর শুনিয়া এরূপ বিশ্বাস করিবারও এতটুকু অবকাশ মাত্র ছিল না। সুতরাং কথাটা বিধুভূষণের কর্ণে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত শুনাইল। তিনি গুড়গুড়ির নলটা মুখ হইতে নামাইয়া, সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, সোজা হইয়া বসিলেন; এবং বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বড় দিদির মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ কাশী পাঠিয়ে দেব কেন?"

"আমি ম্লেচ্ছাচার সইতে পারব না!"

"ম্লেচ্ছাচার? কে ম্লেচ্ছাচার করচে—বিনোদ বুঝি?"

"বিনোদ নয়, তুমি নিজে। তোমারই ম্লেচ্ছাচারের কথা কইচি।"

"আমার ম্লেচ্ছাচার?" বলিয়া অতিমাত্র বিস্মিত বিধুভূষণ জিজ্ঞাসু নেত্রে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বস্তুতঃ, বিধুভূষণের নামে ম্লেচ্ছাচারের অভিযোগ নিতান্তই অসম্ভব

বলিয়া বোধ হইত। গোঁড়া হিন্দু বলিয়া তিনি মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতেন; সরকারী কর্ম্মের অবসরে যতটুকু সময় পাইতেন, তাহা সন্ধ্যাহ্নিক ও জপতপেই কাটাইয়া দিতেন। কোনরূপ নিষিদ্ধ খাদ্য তাঁহার বাটীর ত্রিসীমানায় আনিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। এমন কি, বিনোদ কলিকাতায় থাকিয়া চা খাইতে শিখিয়াছিল; কিন্তু বাড়ীতে সেটুকুও তাহার জুটিত না বলিয়া, সে সহজে বাড়ীতে আসিতে চাহিত না; অথবা আসিলেও, বন্ধুবান্ধবের বাড়াতে লুকাইয়া তাহাকে চা পান করিতে হইত! এমন গোঁড়া হিন্দুর বিরুদ্ধে হঠাৎ ম্লেচ্ছাচারের অভিযোগ করিলে, তাহার বিস্মিত হইবারই কথা।

বিধুভুষণ যে আসল কথাটা এখনও বুঝিতে পারেন নাই, বিন্ধ্যবাসিনী তাহা বুঝিলেন; তাই তিনি কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিবার জন্য কহিলেন, "বিনোদের সঙ্গে তোর দেখা হয়েচে? সে কলকেতা থেকে কি শুনে হঠাৎ বাড়ী চলে এসেছে; এসে অবধি বাছা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্চে, সে খবর নিয়েছিস?"

"বিনোদ পড়াশুনা ছেড়ে হঠাৎ অসময়ে বাড়ী এল যে! এমন কি কথা সে শুনে এসেছে?"

বিন্ধ্যবাসিনী দেখিলেন, ভ্রাতা আসল কথার দিক দিয়াও যাইতেছে না। এইবার তিনি স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই না কি হারাধন উকীলের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে যাচ্চিস?"

এতক্ষণে বিধুভূষণ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন; ভয়ে

তাঁহার মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার উন্নত মস্তক ধীরে ধীরে নত হইয়া আসিল।

বিনোদের কথা ত তাহা হইলে মিথ্যা নয়! কিন্তু এই অরুচিকর বিষয় লইয়া ভ্রাতার সহিত বাদানুবাদ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; করিলেও তাহাতে যে কোন ফল হইবে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। তথাপি ভ্রাতার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যদি কিছু বলিবার থাকে, এই মনে করিয়া তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বিধুভূষণ মাথাও তুলিলেন না; কথাও কহিলেন না। তখন অগত্যা তিনি কহিলেন, "তুমি ত আর এখন ছেলে মানুষটি নও। তুমি যা'ভাল বুঝবে করবে; তাতে আমি কিছুই বল্‌তে চাইনে। কিন্তু মেয়েটার বিয়ের কি করবে? এর পর তাকে ত আর হিঁদুর ঘরে দেওয়া চল্‌বে না, কেউ তাকে নেবেও না।"

"দিদি, তুমি রাগ করছ, কিন্তু আমার অবস্থাটা বুঝ্‌তে পারছ না। আমি নিতান্ত বিপদে পড়েই এমন কাজ কর্‌তে যাচ্চি। আমার আর অন্য উপায় নেই।"

'রাগ আমি করি নি। তোমাকে বিয়ে কর্‌তে বারণও করি নি। তুমি যখন বল্‌ছ, বিপদে পড়ে এমন কাজ কর্ত্তে হচ্চে, তখন সে কথাও মানি। হারাধন উকীল যে বড় সহজ লোক নয়, তাও আমি জানি। তোমাকে আমি এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করিচি,—তোমাকে জান্‌তে আর আমার কিছুই বাকী নেই। তুমি যে কারে' পড়ে বিধবা বিয়ে কর্‌চ, তাও আমি বুঝি।

কিন্তু আমিও ত হিন্দুর মেয়ে ; আমি নিজের চক্ষে এমন ম্লেচ্ছের কাণ্ডকারখানা দেখি কেমন করে? বিনোদকে কি বল্‌বে? সে চিঠি পেয়ে কল্‌কেতা থেকে ছুটে এসেছে। আমার কাছে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। আমি তাকে একটু ভরসা দিতে পারলুম না। তাকে কি বলে'বোঝাবে? দু'বছর হোলো, তার মা মরেছে, এই দু'বছরে বাছা আমার আধখানা হয়ে গেছে। সেও ত কচি খোকা নয়। তারও ত জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে; সে লজ্জায় মরে যাচ্চে। তার মুখের দিকেও ত একবার চাইতে হব!"

"বিনু কখন এল?"

"তিনটের সময় এসে পৌঁছেচে। তার এমনি লজ্জা হয়েচে যে, সে কারুর সাম্‌নে বেরুতে পর্য্যন্ত পাচ্চে না। সে এসে অবধি তার নিজের ঘরে শুয়ে আছে।"

"কি আর বলব দিদি। যার অদৃষ্টে যা আছে, তাই ঘটবে। আমাকে আর কোন কথা বোলো না। মনে কর, আমি মরে গেছি।"

বিন্ধ্যবাসিনী ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি ছিল না। এই ভাইটিকে তিনি পাঁচ বৎসর বয়স হইতে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহাকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার আর কোন ভাই ভগিনীও ছিল না। সুতরাং পিতার একমাত্র বংশধর এই ভ্রাতার প্রতিই তাঁহার সমস্ত স্নেহ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। এখন বিধুভূষণ এমন একটা সমাজ ও ধর্ম্ম বিগর্হিত কর্ম্ম করিতে উদ্যত হওয়ায়, তিনি মুখে যতই রাগ

প্রকাশ করুন না কেন, ভিতরে ভিতরে ভ্রাতার অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "ষাট্, ষাট্—অমন অলক্ষণে কথা বলিস নি। মরবি কেন? এমন কি আর লোকে করে না? আজকাল ত হচ্চে এ সব। যাতে তুই সুখে থাক্‌বি, তাই কর,—আমার মুখের দিকে তোকে চাইতে হবে না। তবে আইবুড়ো মেয়েটার জন্যেই একটু ভাবনা হয়। তা' ওর্‌ও না হয় ব্রাহ্ম মতে বিয়ে হবে।"

"সুখের কথা বোলো না দিদি, সুখের জন্যে আমি এ বিয়ে করছি না। সুখ আজ আমার দু'বছর হল ঘুচে গেছে। সব কথা ভেঙ্গে বলবার উপায় থাকলে আমি তোমাকে বলতুম। তাহলে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌তে, কি রকম বিপদগ্রস্ত হয়ে, কতখানি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পেয়ে আমি এমন কায কর্‌তে বাধ্য হচ্চি। তা হলে তুমি আমাকে একটুও দোষ দিতে পার্‌তে না। যাক্, যা অদৃষ্টে আছে, তা' ঘট্‌বে। মিছে ভেবে কোন ফল নেই। আজ যদি আমার মরণ হোতো, তা'হলে আমি যথার্থই সুখী হতে পারতুম। তোমার স্নেহ হারিয়ে, সমাজে একঘরে হয়ে, লোকের কাছে হীন, অপদস্থ, অপমানিত হয়ে, আমাকে বেঁচে থাকতে হোতো না।"

বিন্ধ্যবাসিনীর মন প্রথমটা অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল; ভ্রাতার সহিত কথোপকথনের পর, তাহার বিপন্ন অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার মন অনেকটা নরম হইয়া আসিল। প্রথমে তিনি ভ্রাতাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিয়া এই খেয়াল বন্ধ করিবার কল্পনা করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু কথাটা পাড়িতেই বিধুভূষণের মুখখানি এমন পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া, তিরস্কার করিবার প্রবৃত্তি আর তাঁহার ছিল না। এখন আরও নরম হইয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "যাক্, ভেবে আর কি কর্‌বে? যখন কোন উপায়ই নেই, তখন ভগবানের উপর নির্ভর করে' বসে থাক; যা' অদৃষ্টে থাকে ঘটুক। এখন আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও; আমার ত আর এখানে থাকা হতে পারে না।"

"তা আমি জানি। সে ব্যবস্থা আমি শীগ্‌গির করে দিচ্চি। ছুটীর দরখাস্ত করেছি; দুই এক দিনের মধ্যেই মঞ্জুর হয়ে আস্‌বে। কলকাতার বাড়ী ভাড়া হয়েচে। ছুটীর ক'মাস কলকাতায় থাক্‌তে হবে। কলকেতায় যেয়েই তোমায় কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব। আর তোমার খরচপত্রের জন্যে ফি মাসে একশো টাকা করে' পাঠিয়ে দেব।"

বিন্ধ্যবাসিনী ভ্রাতার সুবিবেচনায় মনে মনে প্রীত হইলেন; "একশো টাকা আমার চাই না। মাসে ২৫টা টাকা হলেই আমার খুব চলে যাবে—সেখানে জিনিষ পত্তর বাঙ্গালা দেশের চাইতে ঢের সস্তা; তাই তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিও।"

"না দিদি, তুমি যে সেখানে গরীবের মতন থাক্‌বে, সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। তীর্থস্থানে তোমার দান ধ্যান, বারব্রত আছে ত। আমি তোমায় মাসে একশো করেই পাঠিয়ে দোবো।"

"আচ্ছা, সে যা হয় পরে হবে। এখন তুমি একবার বিন্নুকে

ডাকিয়ে দুটো কথাবার্ত্তা কও। উপযুক্ত ছেলে, শুনে অবধি মন-মরা হয়ে রয়েচে—তার মনে কষ্ট দিও না।"

"আমি কি তা' জানি নে দিদি? তোমার বৌ মারা যাবার পর এই দু'বছরের মধ্যে কতগুলো সম্বন্ধ এল—আমি কি কারুকে আমোল দিয়েচি? কুলীন বামুণের ঘরে যখন এ-সব ছিল, তখন ছিল। এখন ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছে। আর কি এমন কাজে হাত দিতে পারা যায়? তবে এ একটা বিপদ বলতে হবে। তোমাকে সব কথা বলতে পাচ্ছি না বলে আমার মনে কত কষ্ট হচ্চে, তা যদি তুমি বুঝতে পারতে!"

বিধুভূষণের স্বর ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিল। তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। নত মস্তকে কাছারীর কাগজপত্র গুছাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী কহিলেন, "আমি তা'হলে সন্ধ্যে করিগে; তোমার ছেলে এসে আমার সন্ধ্যে ঘুচিয়ে দিয়েচে। বিনোদকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দোবো কি?"

"না, এখন থাক; আমি নিজেই—এই যে বিনোদ এসেছ; ঐখানে বোসো।"

৪

বিনোদ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটু যেন অবিনীত স্বরে কহিল, "বাবা, আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দিন।"

এই অপ্রত্যাশিত অনুরোধে বিস্মিত, বিরক্ত হইয়া বিধুভূষণ জবাব দিলেন, "ও সব পুরোনো খেয়াল আবার কেন ?"

"খেয়াল আবার কি ?"

"তা নয় ত কি ! ও কথা ত একবার হয়ে গেছে।"

"তখন এক অবস্থা ছিল ; এখন সে অবস্থা বদ্‌লে গেছে।"

বিধুভূষণ চমকিয়া উঠিলেন। যে সুবোধ, শান্ত, সংযত পুত্র দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার সম্মুখে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পর্য্যন্ত সাহস করে নাই, আজ এতটা সাহস তাহার কোথা হইতে আসিল ? সে এই কথায় কি যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করিতেছে, তাহা বুঝিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়া তিনি যে উপযুক্ত পুত্রকে কিরূপ মর্ম্মপীড়া দিতেছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। বিনোদের কথায় যে ঔদ্ধত্যের আভাষ প্রকাশ পাইতেছিল, অন্য সময়ে তিনি নিশ্চয়ই তাহা ক্ষমা করিতে পারিতেন না ; কিন্তু আজ তিনি ঘোর অপরাধী ; দিদির কাছে, পুত্রের কাছে, সমাজের কাছে তিনি অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী। তিনি যে অধঃপতনের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, নিজের কাছেও তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—তিনি পুত্রকে শাসন করিবেন কোন্ লজ্জায় ? এমন অবস্থা না হইলে বোধ করি পুত্রের মুখ হইতে এমন ইঙ্গিত কখনও বাহির হইত না। নিজের অবস্থা স্মরণ হওয়ায় বিধুভূষণের মুখখানায় যেন কে কালি মাখাইয়া দিল। পিতার নিতান্ত বাধ্য, পিতৃভক্ত, নিরীহ পুত্র মনে-

মনে কতখানি ব্যথা পাইয়া আজ তাহার মৌন, মূক প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া বিধুভূষণ নিজেও অন্তরে বিষম বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। পাপের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। উপায়হীনতার উত্তেজনায় যেন মরিয়া হইয়াই তিনি বলিলেন, "বিলেত যাওয়া ত অমনি হয় না; সে অনেক টাকার খেলা—আমার অত টাকা নাই।"

বিধুভূষণ স্বভাবতঃ কৃপণ নহেন; পুত্রের বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য যথোচিত অর্থব্যয় করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু আচারে ব্যবহারে তিনি গোঁড়া হিন্দু;—সেই সংস্কার বশেই, তিনি পূর্ব্বেও একবার যেমন তাহার বিলাত-যাত্রার প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন, অভ্যাস বশতঃ এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ আপত্তি করিয়া বসিলেন। কিন্তু গতবারে জাতি যাওয়ার আশঙ্কা করিয়া যে প্রস্তাব সহজেই মিটাইতে পারিয়াছিলেন, এবার সে ওজর করিবার পথ ছিল না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, অর্থাভাবের কথা তুলিয়া, এবার তাঁহাকে আপত্তি করিতে হইল।

বিলাত যাইবার জন্য বিনোদের বরাবরই প্রবল আগ্রহ ছিল। বি-এ পাশ হইবার পরই প্রথমবার সে যখন বিলাত-যাত্রার প্রস্তাব করে, তখন তাহার জননী বর্ত্তমান ছিলেন। তিনিও তাহাকে বিলাতে যাইতে দিতে সম্মত ছিলেন না। বিলাত-যাত্রার পক্ষে পিতা মাতার অমতের একমাত্র কারণ,

ধর্ম্ম ও সমাজ। এখন পিতা যখন স্বয়ং সমাজ ও ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন পূর্ব্বের সেই বাধা আর নাই মনে করিয়াই, বিনোদ নিতান্ত আশ্বস্ত চিত্তে বিলাত-যাত্রার কথা উত্থাপন করিয়াছিল। এবারও যে পূর্ব্ববারের মত বাধা পাইবে, এ কথা তাহার মনেই হয় নাই। এখন কিন্তু অন্য কারণের উল্লেখে পিতা তাহার বিলাত যাত্রার প্রস্তাবে আবার আপত্তি করায়, সে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত ভাবে কহিল, "আমি গিল-ক্রাইষ্ট প্রাইজ পেয়েছিলুম, আমার খরচপত্র লাগত না; তখন আপনি যেতে দিলেন না কেন? তখন এক রকম আপত্তি করেছিলেন, এখন আবার আর এক রকম আপত্তি কচ্চেন। তখন যেতে দিলে, এতদিনে আমি হয় ত ফিরে আসতে পার্ত্তুম।"

"তা যখন হয় নি, তখন সে কথা আবার কেন? তোমার বিলেত যাওয়া আমার ইচ্ছে নয়।"

"কিন্তু আমি যাবই। সিবিল সার্ব্বিস একজামিন দিবার আর বয়স নাই; আমি ব্যারিষ্টার হোতে চাই!"

"তবে তোমার যা খুসী করগে—আমি একটী পয়সাও দিতে পারব না।"

"আপনি না দেন, মা আমাদের জন্য যে টাকা রেখে গেছেন, তাই দিন।"

"তা অবশ্য তুমি পেতে পার। তোমার মার টাকায়

অর্দ্ধেক তোমার প্রাপ্য। সে টাকা তুমি পাবে; কিন্তু তাতে তোমার বিলেতে থাকার খরচ কুলিয়ে উঠ্‌বে না। আমি কিন্তু একটীও পয়সা দোবো না, তা' এখন থেকেই বলে রাখ্‌চি। এ টাকা খরচ হয়ে গেলেই তুমি যে আমাকে টাকার জন্যে তাগাদা করবে, তাতে কোন ফল হবে না। তুমি সেখানে হাজার কষ্ট পেলেও, আমার কাছ থেকে একটী পয়সার সাহায্যও পাবে না, এইটী মনে মনে বুঝে তবে যেও। আর, ভবিষ্যতেও তুমি আমার কাছ থেকে টাকা কড়ির প্রত্যাশা কোরো না।"

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিনোদ কহিল, "আপনি ঐ টাকাই আমাকে দেবেন, তা হলেই যথেষ্ট হবে। তার পর যা' হয় হবে। আমি আর আপনাকে কখনও টাকার জন্য বিরক্ত করব না। আপনি যদি আমাকে ত্যাগই করেন, তা' হলে আর উপায় কি?" অভিমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, "যদিও বিলাতের সমস্ত খরচটা হিসেব মত আপনারই দেওয়া উচিত; কারণ, আমি গবর্মেণ্ট স্কলার-সিপ পেয়েছিলুম, স্বচ্ছন্দে যেতে পারতুম; আপনার কোন খরচ লাগত না; আপনি যেতে দেন নি বলেই সেটা লোক-সান হয়ে গেল। তবু আপনি যখন বল্‌চেন, দেবেন না, তখন দেবেনই না; আমিও চাইব না। কিন্তু বিলেতে আমাকে যেতেই হবে, না গেলে চলবেই না।" এই বলিয়া বিনোদ

পিতার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, পিসিমা কহিলেন, "যাস নে, একটু দাঁড়া।"

বিনোদ রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, "আর দাঁড়িয়ে কি হবে পিসিমা? বিলেত যেতে তোমরা আমাকে বাধা দিও না"

"তুই কি এখনি বিলেত চল্লি না কি? ভয় নেই, তোকে আমি বাধা দিতে চাই নি। আমার কথাটা শুনেই যা না!" ভ্রাতার পানে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি ওকে বিলেতে যেতে বাধা দিচ্চ কেন? ওর যাতে উন্নতি হয়, তা' তোমার করা উচিত। ওর মা নেই বলে কি ও বানের জলে ভেসে এল?"

"ওর মা থাকলেই কি ওকে বিলেত যেতে দিত? সে বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই ত বিনু বিলেত যেতে চেয়েছিল, সে কি তাতে রাজী হয়েছিল? আমি বরং তারই ইচ্ছামত চলতে চাচ্চি। আর আমি কি ওর উন্নতিতে বাধা দিতে চেয়েচি? ওকে এতগুলো পাশ করিয়ে মানুষ কল্লে কে? ওর মা, না, আমি? তবে বিলেত গিয়ে বিশেষ কোন উন্নতি করতে পারবে বলে আমার ভরসা নেই। মিছে কতকগুলো টাকা নষ্ট করে আসবে। চাই কি বিলেত গিয়ে ওর স্বভাব বিগড়ে যেতেও পারে। আর ও যে রকম মুখচোরা, ব্যারিষ্টার হয়ে এলেও, ও যে পসার কর্‌তে পার্‌বে, আমার তা বিশ্বাস হয় না। তার চেয়ে, ওকালতী পাশ করে মুন্সেফী করুক, কিম্বা যদি এটর্ণি হয়, তা' হলে ঐ টাকাগুলোতে ব্যবসার অনেক সুবিধে হবে। সে জন্যে

টাকা দিতেও আমি রাজী আছি ; কিন্তু নষ্ট করবার জন্যে টাকা দিতে পারি না। তা' ছাড়া, ব্যারিষ্টারদের উপর আমার বড় বিশ্বাস নেই। অনেক উকীল সাধারণ ব্যারিষ্টারদের চেয়ে ঢের বেশী রোজগার করে। মান্যও তাদের কিছু কম নয়।"

"কিন্তু, ওর যখন ব্যারিষ্টার হবারই ইচ্ছে হয়েচে, তখন যাকই না বিলেতে ? তুমি খরচ দেবে না কেন ?"

"এই ত বললুম, আমি অপব্যয় করতে টাকা দিতে পারব না। বিনু ওকালতী পাশ করবার পর, পসার করবার জন্যে যত টাকা দরকার, তা আমি দিতে রাজী ছিলুম ; কিন্তু বিলেতে পাঠানো,—শুধু অনর্থক অপব্যয়।"

"তবে তুমি যে আমাকে কাশীবাস করবার জন্যে মাসে একশো করে দিতে চাচ্ছ, তাই থেকে ২৫ টাকা আমাকে দিয়ে, বাকী ৭৫ টাকা মাসে মাসে ওকে পাঠিয়ে দাও।"

বিধুভূষণ একটু ভাবিয়া, কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন ভাবেই বলিলেন, "তা যদি তুমি দাও অপব্যয় করতে, তাতে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু ৭৫ টাকায় ওর কি হবে ?"

"তুমি সে টাকাটা ওকেই পাঠিয়ে দিও।"

"আচ্ছা, ভেবে বলব।"

"এর আর ভাবাভাবি কি ?"

"তাই না হয় হবে।"

বিনোদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে সকৃতজ্ঞ নয়নে

পিসিমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আর কিছু বল্‌বার আছে তোমার পিসিমা?"

"না; তুই এখন যেতে পারিস।"

বিনোদ চলিয়া গেলে, বিন্ধ্যবাসিনী যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "বিধু, এ বিয়ে বন্ধ করবার কি কোন উপায়ই নেই?"

"না দিদি; থাক্‌লে আমি কখনই এমন ম্লেচ্ছের কাজ কর্‌তুম না।"

"কিছু টাকা ধরে দিলে হয় না?"

"ওরা ত টাকার কাঙ্গাল নয়!"

"আচ্ছা, আসল কথাটা কি আমাকে একেবারেই বলা যায় না? তা' হলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তুম, কোন উপায় করা যায় কি না।"

"তা' হলে দিদি, তোমায় কি বিনোদের মুখে এ কথা শুন্‌তে হয়? আমি নিজেই ত তা' হলে তোমায় বল্‌তে পার্‌তুম। আমি যে কতটা অপদার্থ, তা' ত আগে জানতুম না। আমি একরকম চোখ চেয়ে, সজ্ঞানে, জেনে শুনে ওদের ফাঁদে পা দিয়েছিলুম। এখানকার কোন লোক যখন ওদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে না, তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল, সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তখন এতটা ভেবে দেখি নি, কেউ আমায় সাবধানও করে দেয় নি। আর দোষই দোবো কার? আমার নিজের দোষে আমার

নিষ্কলঙ্ক কূলে কালি পড়ল। ছেলেটার বিয়ে হয়ে গেছে ; কিন্তু মেয়েটার বিয়ে যে কেমন করে দোবো, তা ভেবে ঠাওরাতে পাচ্ছি না। বোধ হয় ব্রাহ্ম কি খৃষ্টানের হাতেই মেয়েকে সম্প্রদান কর্তে হবে।”

“আমায় কবে কাশী পাঠিয়ে দেবে ?”

“সে ত বলেছি, কল্‌কেতায় গিয়েই তোমার কাশীবাসের ব্যবস্থা করে দোবো।”

“বিনোদকে সত্যিই তবে কিছু দেবে না তুমি ? পঁচাত্তর টাকায় কি বিলেতে চলে ? অন্ততঃ শ দেড়েক করে দাও।”

“একটী পয়সাও নয়।”

“এ তোমার অন্যায় কথা। বিনু ত কিছু অন্যায় বলে নি। ও জলপানি পেয়ে যখন যেতে চাইলে, তখন ওকে যেতে দিলে না কেন ? তা' হলে ত তোমার সত্যিই কিছু খরচ লাগত না !”

“আমি কি টাকা খরচের ভয়েই যেতে দিই নি দিদি ? তুমিও কি তাই বুঝ্‌লে ? ছেলে মেয়ের জন্য টাকা খরচ কর্‌তে আমি কি কোন দিন নারাজ ? বিনোদকে বিলেতে যেতে দিতে তখনও রাজী ছিলুম না, এখনও নই,—কারণ সেই একই। তবে ও এখন আর কচি খোকাটি নয়—এখন যদি ও জেদ ধরে, তবে ওকে শাসন করবার আমার কোন ক্ষমতা নেই। বয়স হয়েচে, নিজের ভাল মন্দ বোঝবার ক্ষমতা হয়েচে—যা' ইচ্ছে যায়, করুক। কিন্তু বৌমার সম্বন্ধে

কি ব্যবস্থা করতে চাও ? আগে যখন যেতে চেয়েছিল, তখন তবু বিয়ে হয় নি। এখন ত বিয়ে হয়েছে,—ও বিলেত চলে গেলে বৌমার অবস্থাটাও ভেবে দেখতে হবে ত!”

“হাঁ, সেটা একটা ভাব্‌বার কথা বটে।”

“তুমি থাক্‌লে বৌমার জন্য ভাবনা ছিল না ; ঘরের বৌ, ঘরেই থাক্‌ত। কিন্তু তুমি চল্লে কাশী ; বিনোদ চল্লো বিলেত ; এমন অবস্থায় বৌমার জন্যে একটা ব্যবস্থা না কল্লে ত চলে না।”

“বেয়াইকে আস্‌তে চিঠি লিখে দাও। তিনি এলে, তাঁকে বেশ করে বুঝিয়ে বল ; তিনি তাঁর মেয়েকে নিয়ে যান। আহা! বৌমার মতন লক্ষ্মী মেয়ে আমি দুনিয়ায় দুটি দেখি নি।”

“সবাই বলে, আমি টাকার লোভে কাল বৌ ঘরে এনেচি। কিন্তু তোমরা এখন বুঝ্‌চ ত, সে কথা সত্যি নয়! মেয়েটিকে সুলক্ষণা দেখেই, কালো হলেও, আমি পছন্দ করেছিলাম। তখন টাকার কথা ওঠে নি। আমি কিছু চাইও নি। বৌমার বাপ বড়মানুষ, সে ইচ্ছে করে মেয়ে জামাইকে দিয়েচে।”

“বিনোদের এটা কিন্তু ঠিক কাজ হচ্চে না। অমন লক্ষ্মী বৌকে পায়ে ঠেললে, তার কখনও লক্ষ্মীশ্রী হবে না। আমি বিনুকে খুব বোঝাচ্চি ; কিন্তু ছেলে একেবারে বেঁকে বসে আছে,—সোজা করে কার সাধ্যি।”

“বিনুকে বিলেত যেতে দিতে আমার একটা মস্ত আপত্তি

বৌমার জন্যে। বিলেতে গিয়ে, সেখানকার সমাজে মিশে, ও যে এখানে ফিরে এসে বৌমাকে নিয়ে ঘর করতে চাইবে, এ তুমি কিছুতেই মনে কোরো না। এখনই যখন কালো বলে মনে ধরচে না, তখন ত আরও বেঁকে বসবে।"

"বৌমার অদৃষ্টেও বড় দুঃখ আছে দেখতে পাচ্চি। তা' তুমি বেয়াইকে একখানা চিঠি লিখে দিও।"

"সেটা আমার না কল্লেই নয়? তুমি বেয়াইকে একখানা চিঠি লিখে দাও না যে,—বিনোদ বিলেত চল্লো, তুমি কাশী যাচ্চ,—কচি বৌ একলা থাকবে—তারা এসে তাদের মেয়ে নিয়ে যাক।"

"আচ্ছা, আমিই বেয়ানকে একখানা চিঠি লিখে দিচ্চি।" এই বলিয়া বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহার অসমাপ্ত জপ সারিবার জন্য কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

৫

সুলোচনার মুখ ফুটিয়াছে। তাহার বয়স বেশী নয়; বিবাহের পর এই প্রথম সে শ্বশুর-ঘর করিতে আসিয়াছে; সুতরাং সে এখনও কনে-বৌ; ইহার মধ্যেই তাহার মুখ ফুটিবার কথা নয়। তথাপি অবস্থার গতিকে তাহাকে মুখ ফুটাইতে হইয়াছে।

শ্বশুর-ঘর করিতে আসিবার পর, স্বামীর প্রথম দিনের ব্যবহারেই সে বুঝিয়া লইয়াছে, তাহার বিবাহিত জীবন

বড় সুখের হইবে না। বরং এটা খুবই সম্ভব যে, তাহাকে সধবা হইয়াও বিধবার ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইবে।

নিজের অধিকারের গণ্ডী কোথায়, তাহা অত্যন্ত শিশুতেও বুঝে। গৃহপালিত বা বন্য পশু-পক্ষীরও নিজের অধিকারের সীমা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকে। সুলোচনা যতই ছেলেমানুষ হউক, হিন্দুর পরিবারের ক'নে-বৌ বলিয়া তাহার যতই লজ্জা করিবার কথা হউক, যেখানে তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া টান পড়িয়াছে, সেখানে লজ্জা করিতে গেলে চলে না, এ কথা সেও বুঝিয়াছে। স্বামীর উপর স্ত্রীর যে স্বাভাবিক অধিকার ও দাবী আছে, তাহা যখন সে সহজে পাইতেছে না, সেই অধিকার হইতে তাহাকে যখন অত্যন্ত অন্যায় পূর্ব্বক বঞ্চিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তখন তাহার সেই ন্যায্য অধিকার পাইবার জন্য নিজেকেই শক্ত না করিলে চলিবে কেন? স্ত্রী যদি স্বামীর ভালবাসা না পাইল, স্বামী যদি তাহাকে গ্রহণই করিতে না চাহিল, তাহা হইলে তাহার জীবনই যে বৃথা! নারী জন্ম এইরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইবার পূর্ব্বে, তাহাকে সফল করিবার জন্য, অন্ততঃ একবার চেষ্টা করাও ত আবশ্যক!

হিন্দুর গৃহে কন্যার সচরাচর যেরূপ অনাদর হয়, সুলোচনার সেরূপ দুর্ভাগ্য ঘটিবার কোন কারণ ছিল না। সুলোচনা ধনীর একমাত্র কন্যা। একমাত্র মেয়ে বলিয়া পিতৃগৃহে তাহার আদরের সীমা ছিল না। সে পিতামাতার নিকট হইতে পুত্রাধিক স্নেহ যত্ন লাভ করিয়াছিল। তাহার কোন আবদার

কখনও উপেক্ষিত হয় নাই। তাহার সুশিক্ষার জন্য তাহার ভ্রাতৃগণের সমান সুবন্দোবস্ত ছিল। শ্বশুর-বাড়ীতেও সে একমাত্র বধূ। শ্বশুর, পিস্‌শাশুড়ী, দাসদাসী—সকলেরই সে স্নেহযত্ন ও সম্মানের পাত্রী। কেবল স্বামীই তাহার প্রতি বিমুখ। কিন্তু তাহার অপরাধ কি? কেন সে স্বামীর সোহাগে বঞ্চিতা থাকিবে?

প্রথমে সে মনে করিয়াছিল, আজ না হউক, দুদিন পরেও স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিবেন। এক সঙ্গে থাকিতে থাকিতে স্বামী ক্রমশঃ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন। স্নেহ-যত্নে পশু-পক্ষীকে বশ করা যায়; আর একজন মানুষের—শিক্ষিত যুবকের মন পাওয়া যাইবে না? সুলোচনা সর্ব্বপ্রকারে স্বামীর মনের মত হইয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। স্বামীর সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি না হয়, সে পক্ষে সে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। তাহার স্বামী যাহা ভালবাসেন, যাহা চাহেন, সে সেই রকম ভাবেই নিজেকে পরিচালিত করিবে। ইহাতেও কি স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিবেন না? স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামী যাহা প্রত্যাশা করিতে পারেন, সুলোচনার তাহার কোন্‌টার অভাব? সে রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়াছে; রাঁধিতে জানে; গৃহস্থালীর সকল কাযই সে সুন্দররূপে সুশৃঙ্খলে করিতে পারে। সূচীকর্ম্মে, পশম ও রেশমের কাযে সে অদ্বিতীয়া। এমন কি, গীত-বাদ্যের সম্বন্ধেও তাহার পিতা তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখেন নাই। একজন মেম শিক্ষয়িত্রী প্রত্যহ বহুদিন ধরিয়া তাহাকে ইংরেজী সাহিত্য পড়াইয়াছে

এবং নানাপ্রকার সৌখীন শিল্পকর্ম্ম শিখাইয়াছে। তাহার কিসের অভাব ? নাই কেবল তার রূপ ; কিন্তু কেবল রূপই কি সর্ব্বস্ব ? গুণ কি কিছুই নয় ? প্রেমে কি রূপের অভাব মেটানো যায় না ? পুরুষ মাত্রেই কি কেবল রূপ খোঁজে ? তাহারা কি গুণের আদর করিতে জানে না ? সুলোচনা প্রেমের বলে স্বামীকে আপনার করিয়া লইবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহার সে আশায় ছাই পড়িতে বসিয়াছে। স্বামী যদি বিলাত চলিয়া যান, তাহা হইলে তাহার সকল আশা ভরসা নষ্ট হইবে। যিনি এখনই রূপের অভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন না, তিনি দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করিয়া, সেখানকার রূপসীদের সঙ্গে মিশিয়া, যে রূপের মোহ লইয়া ফিরিয়া আসিবেন, তাহা দূর করিয়া স্বামীকে আয়ত্ত করা বড় সহজ হইবে না। অতএব তাহাকে স্বামীর বিলাত-যাত্রায় বাধা দিতে হইবে। নচেৎ তাহাকে স্বামীর আশা ছাড়িতে হইবে।

এ কয় দিন ধরিয়া রাত্রিতে আহারাদির পর বিনোদ শয়ন-মন্দিরে গিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে ; সুলোচনা কখন শুইতে আসে, কখন উঠিয়া যায়, কোথায় শয়ন করে—এ সব কোন খোঁজই সে রাখে না। কিন্তু এমন করিলে ত চলিবে না। গরজ যে সুলোচনারই সবচেয়ে বেশী ! তাই সে আজ বিনোদের জন্য যথাসময়ে শয্যারচনা করে নাই।

পিসিমাও বৌমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

প্রথম দিন হইতেই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, রাত্রে এদের দু'জনের মধ্যে কোনরূপ আলাপ পরিচয় হয় না। অথচ উভয়ের মধ্যে ভাব হয়, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। বাড়ীতে সুলোচনা বা বিনোদের ঠান-দি সম্পর্কীয়া কোন মহিলা নাই যে, এই দুইটী তরুণ হৃদয়ের মিলনের চেষ্টা করিবেন। আর নারীর ব্যথা নারীই শীঘ্র বুঝিতে পারে। বিনোদ যে সুলোচনাকে মোটেই আমল দিতে চাহিতেছে না, ইহাতে সুলোচনার প্রতি তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃই সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল। তিনিও জানিতেন, বিনোদ খাইয়া গিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে। বৌমা তাহার সহিত কথা কহিবার অবসরই পায় না। তাই আজ তিনি সুলোচনার মনের ভাব বুঝিয়া, সে নিজে মুখে ফুটিয়া কোন কথা না বলিলেও তাহাকে সাহায্য করিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন। তিনি সুলোচনাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যতক্ষণ না তাহার আহারাদি শেষ হয়, যতক্ষণ না সে শয়ন করিতে যাইবার অবসর পায়, ততক্ষণ তিনি বিনোদকে কথাবার্ত্তায় জাগাইয়া রাখিবেন। পিসিমার এই সহানুভূতিতে সুলোচনা মুখ ফুটিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে না পারিলেও, লজ্জা আসিয়া বাধা দিলেও, অন্তরে অন্তরে সে পিসিমার প্রতি বার বার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছিল; এবং তাহার মুখে, বিশেষতঃ আয়ত চক্ষু দুটীতে, সেই কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পিসিমারও তাহা অজ্ঞাত ছিল না।

বিনোদকে আটকাইয়া রাখা পিসিমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে। বিনোদ সহজেই পিসিমার একান্ত অনুগত ছিল। তাহার উপর, বিলাত প্রবাসে পিসিমাই তাহার একমাত্র সহায়। বিন্ধ্যবাসিনী তাহার বিলাত-যাত্রার প্রস্তাবের সমর্থন না করিলে, তাহার বিলাত-যাওয়া আদৌ ঘটিত কি না সন্দেহ। এরূপ অবস্থায়, সে আহার করিয়া উঠিলে, বিন্ধ্যবাসিনী যখন বলিলেন, 'একবার আমার কাছে হয়ে যাস; তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে,' তখন সে তাড়াতাড়ি আচমন শেষ করিয়া, পিসিমার ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

বিন্ধ্যবাসিনী তাহাকে কোলের কাছে বসাইয়া, পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, "হাঁ রে বিনু, তোর বিলেত যাওয়ার দিন কবে স্থির হ'ল ?"

"সে এখনও দু'তিন মাস দেরী আছে পিসিমা। বিলেত যাওয়া ত মুখের কথা নয়। কত উদ্যোগ আয়োজন কর্ত্তে হবে; নতুন নতুন পোষাক তোয়ের কর্ত্তে হবে। পাদরী সাহেবদের কাছ থেকে কত সুপারিস্ যোগাড় কর্ত্তে হবে। যা' যা' চাই, সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে দু তিন মাসের কম হবে না। বিলেত-ফেরত বন্ধুদের সঙ্গে কত পরামর্শ কর্ত্তে হবে; তাদের কাছ থেকে কত উপদেশ, কত সন্ধান

সুলভ নিতে হবে। টাকা যখন এত কম, তখন সেখানে যাতে খুব কম খরচে চালাতে পারা যায়, তার উপায় কর্ত্তে হবে। সে অনেক কাণ্ড পিসিমা। বিলেত যেতে ঢের কাঠ খড় লাগে। বিলেত যাওয়া অমনি হয় না।"

বিলাত-যাত্রার প্রসঙ্গমাত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রের উৎসাহ দেখিয়া, পিসিমা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্বাশুড়ী-বধূতে নীরবে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, এক বিলাত-যাত্রার কথা তুলিতেই, তাহা যে সফল হইবে, সে বিষয়ে বিন্ধ্যবাসিনীর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি কহিলেন, "তা, বিলেতে তোর খরচপত্র কি রকম পড়বে? সে সব কি রকম করে যোগাড় করবি?"

বিনোদ পূর্ণ উৎসাহে, অথচ একটু বিবন্ন ভাবে, বলিতে লাগিল, "কলেজের মাইনে আর একজামিনের ফি'তেই ত বছরে হাজার টাকা হিসেবে তিন বছরে তিন হাজার টাকা লেগে যাবে। তার পর সেখানে খাওয়া-পরা আছে, বাসা-ভাড়া আছে, যাবার আসবার জাহাজ ভাড়া আছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাওয়া আছে; দেশভ্রমণ আছে। এ সবে অনেক টাকা পড়ে যাবে।"

"কিন্তু তোর ত সম্বল ঐ তিন হাজার; আর মাসে নব্বুই টাকা। এতে তোর কুলুবে?"

"নব্বুই কোথা, পঁচাত্তর বল।"

"আমি তোকে নব্বুই কোরেই দোবো। তুই যতদিন

বিলেতে থাকবি, ততদিন আমার মাসে দশ টাকা হলে খুব চলে যাবে। সে জন্য তুই কিছু ভাবিস নি।"

"তা না হয় নব্বুই হল। তাতে কি কুলোয় ?"

"তাই ত বলচি। তা'হলে তুই কি করবি ? কোন ভরসায় বিদেশ বিভুঁয়ে একলা যাবি ? বাপকে চটিয়ে বিলেতে গিয়ে কি তোর ভাল হবে ? তুই বিলেত যেতে চাস, তাতে আমার অমত নেই। কিন্তু আমার ত টাকা নেই। তোর বাপ যা' দয়া করে দিতে চাচ্ছে, তাই আমি তোকে দিতে পারি। কিন্তু, যে খরচের হিসেব তুই দিলি, সে যে অনেক টাকা। শুনিচি, বিলেতে মাসে তিনশো টাকার কমে গরীবিয়ানা চালে কষ্টে-স্থষ্টেও চালানো যায় না। তোর শ্বশুরকে বলব ? বল্লে বোধ হয় সে দিতে পারে। তার ত টাকার কমি নেই। আর তার ঐ এক মেয়ে, এক জামাই। ইচ্ছে কল্লে সে তোর সব খরচই দিতে পারে।"

"অমন কর্ম্ম কোরো না পিসিমা। তিনি আবার বাবার চেয়ে এক কাটি সরেস। তিনি আমায় টাকা দেবেন বিলেত যেতে ? বাবা বিলেতকে যতটা ভয় করেন, তিনি আবার তার চেয়ে বেশী ভয় করেন। ঐ জন্যেই ত আমি মোটে ও দিকে ঘেঁসতেই চাই না। আর আমিই বা কোন লজ্জায় তাঁর কাছে টাকার জন্যে হাত পাতব ?"

"সে ঠিক। তুই যখন শ্বশুরের মেয়েকেই মোটে আমল দিতে চাস্ না, তখন শ্বশুরের কাছ থেকে বিলেত যাবার

খরচা চাইবার তোর মুখ নেই বটে। কিন্তু সে লজ্জা কাটা-নোও ত তোরই হাতে।"

"আমি সে ভেবে বলি নি পিসিমা। আমি বল্‌চি, বিয়ের সময় বাবা আমাকে বিক্রী করে অনেক টাকা দাম নিয়েচেন। আমার দাম কি বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্চে যে, আমি আবার তাঁর কাছ থেকে টাকা চাইতে যাব?"

"অমন কথা বলিস নি। বিক্রী আবার কি? ষাট,—ষাট! তুই আমাদের ঘরের ছেলে —তোকে পরের কাছে বিক্রী আবার কে কর্‌তে গেল?"

"ছেলের বিয়ে দিতে হবে, বিয়েই দাও; বিয়ের নাম করে মেয়ের বাপের কাছ থেকে টাকা নেবে কেন? তোমরা যাই বল —এ ছেলে বেচা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"দূর, পাগল! এ যে যৌতুক। এ প্রথা ত বরাবরই আমা-দের দেশে রয়েচে। এ রকম যৌতুক নেবার সময় কেউ কখনো মনে করে না যে, সে ছেলে বেচ্‌চে। আর দেবার সময়ও কেউ মনে করে না যে, সে মেয়ের জন্য টাকা দিয়ে জামাই কিন্‌চে।"

"না, করে না আবার! মেয়ের বিয়ে দিতে যেখানে ভিটে-মাটী উচ্ছন্ন যাচ্চে, কত গরীব গৃহস্থ পথের ভিকিরী হচ্চে, তারা তোমার ঐ যৌতুকই কি হাসি মুখে দিচ্চে, বল্‌তে পার?"

"তা' এখন কোন কোন জায়গায় হচ্চে বটে। কিন্তু সব জায়গায় তা' বলে নয়। এই তোরই কথা ধর না কেন। তোর

শ্বশুর কিছু গরীব নয়; তোর বিয়েতে সে যা' দিয়েচে, তাতে তাকে পথে বস্‌তে হয় নি। ভিটেমাটীও তার উচ্ছন্ন যায় নি। সে মেয়ে জামাইকে খুসী হয়েই দিয়েচে। এতে ত কোন দোষ হয় নি।"

"আচ্ছা পিসিমা, তোমার বিয়ের সময় ঠাকুরদা' কত টাকা যৌতুক দিয়েছিলেন?"

"আমাদের সময় ত এতটা ছিল না। এখন সব বেশী বেশী হয়েচে বটে। আমার বিয়ের সময় তোমার ঠাকুরদা'কে এখন-কার মতন এত খরচপত্র করতে হয় নি। একশো এক টাকা পণ দিতে হয়েছিল; আর বরাভরণ দান সামগ্রী, লোকজন খাওয়ানোতে মোট পাঁচশো টাকার বেশী লাগে নি। এইতেই ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল।"

"তবেই দেখ, এখন অবস্থা কি রকম দাঁড়িয়েচে, কি রকম জুলুম মেয়ের বাপের উপর হচ্চে। তোমার বিয়েতে ঠাকুর-দা' পাঁচ-ছ'শোর বেশী খরচ করেন নি; আর, বাবা আমার বিয়ে দিয়ে কিছু না হবে ত বারো চোদ্দো হাজার টাকা নিয়েচেন। একেও তুমি ছেলে বেচা বল্‌তে চাও না?"

"তেমনি তোর বোনের বিয়েতেও তাকে ঐ রকম খরচপত্র কর্ত্তে হবে।"

"কিন্তু যদি বাবা টাকা না নিতেন, তা'হলে তাঁর জোর থাক্‌ত। তিনি বল্‌তে পারতেন, 'আমি যখন ছেলের বিয়েতে টাকা নিই নি, তখন মেয়ের বিয়েতে টাকা দোবো না।"

"বল্‌তে পার্‌তে বটে, কিন্তু সে কথা শুন্‌ত কে? বরের বাপ জোর করে টাকা আদায় করে নিত।"

"তবেই দেখ,—এ ছেলে বেচা নয় ত কি?"

"কিন্তু এতে ত তোর বাপের একলার দোষ নেই; সব্বাই নিচ্চে, তাই তোর বাপও নিয়েচে।"

"আমিও বাবার একলার দোষ দিচ্চি না। কিন্তু তাই বলে, এটাকে ছেলে বেচা ছাড়া আর কিছুই বলাও যায় না;—সকলেই ছেলে বিক্রী কচ্চে। যাক্, বাবা আমার বিয়ের সময় যে টাকা নিয়েছেন, তার আদ্দেকও যদি আমি পেতুম, তা'হলে আমার কোন ভাবনা ছিল না।"

পিসিমা এবার সুবিধা পাইয়া, একটু হাসিয়া কহিলেন, "সে টাকাই বা তুই নিবি কি কোরে? সেও ত তোর শ্বশুরের দেওয়া টাকা। তোর বাপকে যখন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে,—মেয়ের বিয়েতে যখন তাকে টাকা খরচ কর্ত্তে হবে,—আর, তোকেও যখন সে অনেক খরচপত্র কোরে লেখাপড়া শিখিয়েছে,—তখন ও টাকায় তোর ত কোন অধিকার নেই। আর, তাও যদি না-ও হোত, তবু তুই এ টাকা পেতে পারিস না। তুই যদি তোর বৌকে আদর কোরে নিতিস, তা' হলেও বা তুই ঐ টাকার দাবী করতে পারতিস। কিন্তু, তাও ত তুই করলি না। তা' যদি, তুই করতিস, তা'হলে, তোর বাপ টাকা না দিলেও, আমি তোর শ্বশুরের কাছ থেকে তোর বিলেত যাবার সব খরচা আদায় কোরে দিতে

পারতুম। এখনও যদি তুই বৌকে নিস, তবে এখনও আমি পারি।”

“কিন্তু সেটা অত্যন্ত বেহায়ার কাজ হবে। বাবা এক দফা যতদূর পেয়েছেন, নিয়েছেন। তার উপর আবার আমার দাবী করবার কি পথ আছে? মেয়ের বাপ বলে কি তার উপর এতটা জুলুম ধর্ম্মে সইবে?”

“আচ্ছা, সে যদি খুসী হয়ে দেয়? তার উপর ত জবরদস্তি কিছুই করা হচ্চে না। তুই মানুষ হলে, তার মেয়েই সুখে থাকবে—এই ভেবে সে দিতে পারে।”

“তিনি দিতে পারলেও, আমি নিতে পারি না। আচ্ছা, এটা কত বড় নির্লর্জ্জতা হবে বল দেখি? বাবার টাকার অভাব কিছুই নেই; তিনিই যখন দিতে চাচ্ছেন না, তখন শ্বশুর দেবেন,—কেন?”

“ও কথা কোন কাজের কথা নয়। আমি বল্‌ছি, সে টাকা দেবে,—খুসী হয়ে দেবে। তুই যদি শ্বশুরের কাছ থেকে দান বলে না নিতে চাস, ধার বলে নিতে পারিস। এতে কোন লজ্জা নেই। তার পর তোর যখন রোজগার হবে, তখন সুদে আসলে শোধ করিস।”

এই শ্বশুরের নিকট হইতে টাকা লইবার জন্য পিসিমার এত পীড়াপীড়ি—ইহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে বিনোদের ন্যায় বুদ্ধিমান ছেলের একটুও বিলম্ব হয় নাই। সে নিতান্ত উদাসীনের মত বলিল, “না পিসিমা, সে হয় না।”

বিন্ধ্যবাসিনী এবার একটু বিরক্তি ভাব দেখাইয়া কহিলেন, “তা’ হলে তোর আসল মনের কথা আমি বুঝেচি। তুই ভাবিস, শ্বশুরের মেয়েকে গ্রহণ কোরবো না, অথচ, শ্বশুরের কাছে টাকার জন্যে হাত পাত্‌ব,—দুটো একসঙ্গে হয় না—কেমন, এই না তোর মনের কথা? কিন্তু আমি বল্‌চি, বৌমাকে তুই হেনস্থা কর্‌তে পাবি না। কেন, ওর অপরাধটা কি? তুই তোর শ্বশু-রের টাকা নিস, না নিস,—সে তোর ইচ্ছে। তাই বলে তুই বৌমাকে কিছুতেই অযত্ন কর্‌তে পাবি না। সে আমি কিছুতেই কর্‌তে দোবো না।”

বিনোদ এ কথার কোন জবাব দিল না; সে কি ভাবিতে লাগিল। এমন সময়ে সুলোচনা আসিয়া পিসিমার কাছে বসিল; এবং তাঁহার মাথাটা টানিয়া লইয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিল, “পিসিমা, আমার ত অনেক গয়না রয়েচে,—চার পাঁচ হাজার টাকার হবে। তাই কেন বিক্রী করে টাকার যোগাড় করুন না?”

পিসিমা বিনোদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “শুন্‌লি—বৌমা কি বল্‌চে শুন্‌লি?”

সুলোচনা পিসিমার কাণে কাণে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কথা কহি-লেও, তাহার এক বর্ণও বিনোদের কাণে ফাঁক যায় নাই। সে কিন্তু একটীও কথা কহিল না। পিসিমা সুলোচনাকে কহি-লেন, “তুমি বড় বোকা মেয়ে। আমি তোমাকে এমন অন্যায় কাজ কর্ত্তে কিছুতেই দোবো না মা। বিনু যখন তোমাকে নিতেই চায় না, তখন তুমি তার জন্যে তোমার গয়না খোয়াবে

কেন? ও যদি রোজগার করতে না পারে? পারলেও যদি তোমাকে কিছু দিতে না চায়? তখন তোমার দশা কি হবে বল দেখি?" বিনোদের দিকে ফিরিয়া রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "দেখ্ রে বিনো, তোর বোয়ের কথা শোন। ও তোকে এক গা গয়না খুলে দিতে চাচ্ছে;—তাই বিক্রী করে তোর বিলেত যাবার খরচের যোগাড় কর্‌তে বলচে। এমন বৌকে তুই নিতে চাস না! তুই অতি বড় পাষণ্ড!"

বিনোদ সহসা উত্তেজিত হইয়া কহিয়া উঠিল, "আমি কারুর ঠেঙ্গে একটা পয়সাও চাই নে। আমার জন্যে কাউকে ভাব্‌তে হবে না।"

পিসিমাও একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "সেই কেউ তোকে এক গা গয়না দিতে চাইলেও, আমি অবিশ্যি তোকে একটী পয়সাও দিতে দিচ্ছি না,—তা' তুই ঠিক জেনে রাখিস। তবু আমি তোর আক্কেলকে বোঝাচ্ছি যে, দেখ, তোর কপালে কেমন লক্ষ্মী বৌ জুটেছে। একে অযত্ন কর্‌লে, তোর হাড়ে কখন লক্ষ্মীশ্রী হবে না,—তা' তোকে বলে রাখ্‌চি।"

বিনোদ তেমনি উত্তেজিত ভাবে বলিল, "পিসিমা, আর তোমার কিছু বলবার আছে? আমার বড় ঘুম পাচ্চে।"

"না, আর আমার কিছুই বলবার নেই; যা, তুই শুগে যা।"

বিনোদ সবেগে পিসিমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; কিন্তু নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়াই, চীৎকার করিয়া কহিল, "আজ এখনো বিছানাই হয় নি যে! আমাকে এর মধ্যেই বাড়ী

থেকে তাড়াবার যোগাড় হচ্চে না কি? আর দু'দিন তর সইল না? আমি আপনিই ত যাচ্ছিলুম!"

পিসিমা এবার হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তুই রাগ করিস কার উপর? যাকে তুই ঘরে নিতে চাচ্চিস না, তার উপর কোন্ অধিকারেই বা রাগ করিস?" বলিতে বলিতে তিনি বিনোদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে সুলোচনাও আসিল; কিন্তু সে পিসিমার পিছনেই রহিল,—বিনোদের চীৎকারে সে ভয় পাইয়া গিয়াছিল।

পিসিমা বলিলেন, "বিছানা হ'তে একটু দেরী হয়েছে বলে এত রাগ কিসের? ছেলেমানুষ,—সমস্ত সংসারটাই প্রায় একলা মাথায় করে রয়েচে। সমস্ত দিন খেটে বাছার আমার শরীর দু'দিনেই আধখানা হয়ে গিয়েছে। তবু যদি তুই বৌমাকে ঘরে নিতিস!"

বিনোদ রাগে অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে কহিল, "তোমার দু'টি পায়ে পড়ি পিসিমা,—আমার ঘাট হয়েচে। বিছানা আমি নিজেই করে নিচ্চি। আর, যে কটা দিন বাড়ীতে আছি,—আমার বিছানা রোজই আমি নিজেই করে নোবো। আস্‌চে শনিবারেই আমি কল্‌কেতায় ফিরে যাচ্চি—এই দুটো দিন তোমরা আমাকে কোন রকমে চোখ কাণ বুজে বরদাস্ত করে নাও। তার পর বছর কতকের মধ্যে আর তোমাদের বিরক্ত করতে আস্‌ব না।" এই বলিয়া সে দুদ্দাড় করিয়া খাট হইতে তোষক বালিসগুলা মেঝেয় টানিয়া ফেলিতে লাগিল।

পিসিমা তাহাকে এক ধমক দিয়া কহিলেন, "নে, সরে যাঃ! আর অত ভিরকুটি কর্‌তে হবে না! দাও ত বৌমা, বিছানাটা করে। দেখ, আমি তোর ভালর জন্যেই বল্‌ছি, বৌমার মনে কষ্ট দিস নি। এমন লক্ষ্মী মেয়ের মনে কষ্ট দিলে, তোর কখনো ভাল হবে না। তুই যতই লেখাপড়া শিখিস, আর যতই রোজ-গার করিস—ওর মনে কষ্ট দিয়ে তুই কখনই সুখী হতে পারবি না।" এই বলিয়া বিন্ধ্যবাসিনী নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

৮

শয্যা প্রস্তুত হইলে গজর গজর করিতে করিতে বিনোদ শয়ন করিল। সুলোচনা আলো নিবাইয়া, আস্তে আস্তে বিনোদের পায়ের কাছে বসিয়া, তাহার পদসেবা করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু পায়ে হাত পড়িতেই বিনোদ জ্বলিয়া উঠিল; এবং সজোরে পা দুইটা টানিয়া লইয়া কহিল, "আজ রাত্রে আমাকে ঘুমুতে দেবে না না কি?"

সুলোচনা কোন কথা কহিল না; সে একটু অগ্রসর হইয়া বিনোদের পা দুইখানি টানিয়া নিজের কোলের উপর রাখিয়া টিপিতে লাগিল। বিনোদ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, সুলোচনা বুঝি কাঁদিতেছে। এমন সময়ে দুই এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার পায়ের উপর পড়িল। তখন সে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, একটু আগেই, এই মেয়েটিই, তাহার পিতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কার—প্রায়

সাত আট হাজার টাকার গহনা—নিতান্ত অযাচিত ভাবে তাহাকে দিতে চাহিয়াছিল। তাহার প্রতি এতটা কঠোর হওয়া বাস্তবিকই ভাল কায হইতেছে না। এবং সে তাহাকে স্ত্রীর অধিকার দিতে না চাহিলেও, তাহার নিকট হইতে সেবা পাইবার দাবী করিতে যে ছাড়িতেছে না, তাহাও এই মাত্র বিছানার ব্যাপারে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ, যাহাকে যে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে নারাজ, তাহার একটু সেবার ত্রুটি হইলে সে কোন্ অধিকারে তাহার উপর রাগ করিতে যায়? এবং সেবাই যখন আদায় করিতে চাহিতেছে, তখন স্ত্রীর অধিকার না দিয়াই বা ঠেকাইয়া রাখে কেমন করিয়া? এই সকল কথা ভাবিয়া, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া সে কহিল, "আলোটা নিবুলে কেন? জ্বালা থাকলেই ভাল ছিল না?"

কিন্তু সুলোচনা উত্তর করিল না; নীরবে পা টিপিতে লাগিল। বিনোদ তখন উঠিয়া বসিল; এবং সস্নেহে সুলোচনার একখানি হাত নিজের কোলের উপর টানিয়া লইয়া, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "কাঁদচ?"

স্বামীর এই আদরের আভাষে সুলোচনার অশ্রু দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিনোদ বিলক্ষণ বিপন্ন হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় সে কি কবিবে, ভাবিয়া পাইল না। সে সুলোচনাকে কোন রকমে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিল না। পাছে সুলোচনাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, এই আশঙ্কায় সে এ যাবৎ সুলোচনার নিকট

হইতে আপনাকে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের সহিত পরিচিত, বা তাহার মহিমা অবগত, ছিল না। পুরুষের বলং বলং বাহুবলং সে বিলক্ষণই জানিত; কিন্তু স্ত্রীজাতির রোদনং যে পরমং বলং, তাহা সে মোটেই জানিত না। এই ব্রহ্মাস্ত্রের মহিমা জানা থাকিলে সে বোধ হয় সাবধান হইতে পারিত; কিন্তু তাহা হইল না। তাহাকে অতর্কিত পাইয়া, এবং নিতান্ত নিরুপায় হইয়াও বটে, সুলোচনা আজ এই ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। এখন কিরূপে সে এই ব্রহ্মাস্ত্রের কাটান দিবে, বিনোদের পক্ষে তাহাই মহা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

সে একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "তোমার কিছু বলবার আছে?"

সুলোচনা এইবার কথা কহিতে গেল; কিন্তু প্রথমটা গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না। গলা ঝাড়িয়া দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিয়া সে যাহা বলিল, তাহাও কিছুমাত্র বোঝা গেল না। গলা দিয়া এবার স্বর বাহির হইল বটে, কিন্তু তাহা এত অস্পষ্ট, জড়ানো, এবং দুর্বোধ যে, বিনোদ তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না। সে ক্রমে অধীর হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু কষ্টে সামলাইয়া লইয়া শান্ত, মৃদু, মিষ্ট কণ্ঠে কহিল, "একটু স্পষ্ট করে বল না,—তোমার কথা যে কিছু বোঝা যাচ্চে না।"

সুলোচনা এবার পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল, "তুমি বিলেত যেয়ো না।"

"যাব না? এই মাত্র তুমিই না নিজের সমস্ত গয়না দিতে চাচ্ছিলে?'

"তা দিতে চেয়েছিলুম সত্যি। যদি তুমি নিশ্চয়ই যাও, তা' হলে, তোমার টাকার দরকার হলে, এখনও দিতে রাজী আছি —এখনি। তবু বলছি, তুমি বিলেত যেয়ো না।"

"কেন?"

এ 'কেন'র উত্তর সুলোচনা দিতে পারিল না। এই 'কেন'র উত্তরে তাহার মনে কত কথার উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু সে সব কথা কি বলা যায়? উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটু শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বিনোদ পুনরায় কহিল, "তা' হলে আর গয়নাগুলো দিতে হয় না; অথচ, দিতে রাজী ছিলে, কেবল আমি গেলুম না বলে দেবার দরকার হল না—এমনি একটা নাম থেকে যায়। কেমন, এই না?"

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। বিনোদ নিজেও তাহা মনে মনে বিলক্ষণ জানিত। তবু সে রোরুদ্যমানা বালিকা পত্নীর অন্তরে ঘা না দিয়া কথা কহিতে পারিল না। সুলোচনা কিন্তু ইহার পাল্টা জবাব দিল না,—সে ধার দিয়াও গেল না। সে সহজেই এই আঘাতটা পরিপাক করিয়া কহিল, "আমি তোমার স্ত্রী; —তুমি আমাকে নাও বা না নাও, তবু আমি তোমার স্ত্রী। আমার বলিয়া যদি কিছু থাকে,—যা' কিছু আছে,—সে সমস্তই তোমারই। আমি দিতে না চাইলেও তুমি জোর করে নিতে পার। নিলে আমি কিছুই কর্‌তে পারি না। অথবা জোর

জবরদস্তি করে নিলে মামলা মোকদ্দমা করা চলে শুনেছি; কিন্তু আমি এমন ছোট লোকের মেয়ে নই যে, তোমার সঙ্গে যে কোন কারণেই হোক, আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে যাব। আমি সেই ভেবেই বলেছিলুম যে, যেখানে তোমার জোর খাটে,—তুমি স্বচ্ছন্দে নিতে পার, সেখানে তোমার জিনিষ তুমি নিয়ে বিলেত চলে যাও। আমি নাম কেনবার জন্যে কিছুই বলি নি। বিলেতে না গিয়ে, এখানে থেকেও যদি তোমার টাকার দরকার হয়, তা'হলেও তুমি স্বচ্ছন্দে সমস্ত গয়না নিতে পার। এমন কি, তুমি যদি গয়নাগুলো আমার স্ত্রী-ধন বলে নিতে না চাও, তা'হলে বল, বাবাকে বলে আমি তোমার বিলেত যাবার খরচা মাসে মাসে তিনশো টাকা আনিয়ে দিতে পারি। আমি চাইলে বাবা না দিয়ে থাকতে পারবেন না। তবু আমি বলি, তোমার বিলেতে গিয়ে কাজ নেই।"

বিনোদ পুনরায় সেই আগেকার প্রশ্ন করিল, "কেন? আমি বিলেত গেলে তোমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি?"

এবার আর সুলোচনা এ প্রশ্নের উত্তর এড়াইতে পারিল না। প্রথমবার বলি বলি করিয়াও যাহা সে বলিতে পারে নাই,—কণ্ঠে আসিয়াও যাহা তাহার ওষ্ঠে বাধিয়া গিয়াছিল,—এবার শত বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া পরিষ্কার, ধীর কণ্ঠে কহিল, "তা' হলে তোমাকে আর আমি পাব না!"

কত কষ্টে যে সুলোচনা কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে, বিনোদ তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, নিতান্ত হৃদয়হীনের মতই

প্রশ্নাঘাতে সুলোচনাকে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল, "এখানেই কোন্ পাচ্চ ?'

"এখানে থাকলে একদিন না একদিন পাব—সে ভরসা আমার আছে ; কিন্তু তুমি বিলেত চলে গেলে, আমার আর একটুও ভরসা থাকবে না।"

"এখানে থাকলেও না। সে হয় না। বিলেতে আমাকে যেতেই হবে,—আমার অনেক দিনের সাধ। তোমায় একখানাও গয়না দিতে হবে না,—তোমার বাবাকেও এক পয়সাও সাহায্য করতে হবে না। আর, আমার বাবা ত দেবেনই না। টাকার যোগাড় আমি যেখান থেকে হোক্, যেমন করে হোক, করে নোবো,—সে জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেবো না। বিলেতে আমাকে যেতেই হবে।"

"তাই যদি তোমার ধনুক-ভাঙ্গা পণ, তা'হলে আর মিছে কথার দরকার কি ?" এই বলিয়া সুলোচনা চুপ করিয়া থাকিয়া একটুখানি ভাবিল। বিনোদ এতক্ষণ তাহাকে সরাসরি প্রশ্ন-বাণে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এইবার সুলোচনার প্রশ্ন করিবার পালা আসিল। কহিল, "কিন্তু তুমি আমাকে ত্যাগ কর্‌ছ কেন ? আমি কালো বলে কি ?"

এইবার বিনোদের বিব্রত হইবার পালা। পিসিমাও তাহাকে একবার এই প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এবার কিন্তু সে রাগ করিতে পারিল না। মুখের উপর কড়া কথাটা বলিতেও তাহার বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। সুলোচনা

যে তাহাকে তাহার সমস্ত গয়না দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে কথাটা উড়াইয়া দেওয়া চলে না ত! তাই সে জবাবটা একটু ঘুরাইয়া দিতে গেল, "ত্যাগ ত তোমায় করি নি! তোমাকে গ্রহণই করি নি। যদি গ্রহণ করতুম, তা'হলে ত্যাগ করার কথাটা উঠতে পারত।" কথাটা সে একটু কোমল করিয়া বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু অধিকতর রূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। সুলোচনা কিন্তু তাহা গায়ে মাখিল না। এখন তাহার তর্ক করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটু উগ্র স্বরে, সতেজে কহিল, "কথার ছল ধরে কথা কাটাবার মিছে চেষ্টা কোরো না। আমার আসল কথার জবাব দাও। আচ্ছা, না হয়, তোমারই কথা ধর্‌ছি। তুমি আমাকে গ্রহণ কর নি কেমন করে? বাবা আমাকে কার হাতে সম্প্রদান করেছিলেন? সে কি তোমারই হাতে নয়?—পথের লোকের হাতে বুঝি? তুমি কি তখন হাত পেতে আমাকে গ্রহণ কর নি?'

কি মুস্কিল! এতটুকু মেয়ে—তর্কবাগীশ ত কম নয়! আর, না হবেই বা কেন? নামজাদা উকীলের মেয়ে—নিজেও সুশিক্ষিতা। তার উপর, ঘোর সঙ্কট অবস্থা।

বিনোদ এ প্রশ্নের সহসা কোন জবাব দিতে পারিল না। বিবাহ রজনীর কথা সে বিস্মৃত হয় নাই। তাহার শ্বশুর যে তাহারই হাতে সুলোচনাকে যথার্থই সম্প্রদান করিয়াছিলেন, এবং সেও যে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সুলোচনাকে 'গ্রহণ করিলাম' বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিয়াছে—এ কথা ত কিছুতেই

অস্বীকার করিবার নয়! মুখে সে যতই আস্ফালন করুক, মনে মনে ত সে কোন মতেই সুলোচনাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না! কি জবাব সে দিবে?

বিবাহের পর হইতে সুলোচনার সঙ্গে যত দিন সে একত্র বাস করিয়াছে, তাহার মধ্যে সে সুলোচনার মুখে কথা অতি অল্পই শুনিতে পাইয়াছে। সে সকল গৃহকার্য্যই করিয়া থাকে; কিন্তু কথা খুব কমই কয়। সেই স্বভাবতঃ মৌনী ব্যক্তিকে আজ এত মুখর দেখিয়া, বিনোদ খুবই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু ততোঽধিক আশ্চর্য্য হইল, তাহার যুক্তিপূর্ণ তর্কের শক্তি দেখিয়া। এবং সেই তর্কের কোন সদুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া মনে মনে বিশেষ রুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু রুষ্ট হইয়াই বা সে কি করিবে; অবশেষে এরূপ স্থলে সচরাচর লোকে যাহা করিয়া থাকে, সেও সেইরূপ পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "আজ সমস্ত রাতটাই কি তর্ক করে কাটাবে? নিজেও ঘুমুবে না, আমাকেও ঘুমুতে দেবে না? তুমি না ঘুমোও তুমি বুঝবে। আমাকে ঘুমুতে দাও—বকে বকে মাথা ধরে গেল।"

"ঘুম আমারও পেয়েছে। আমিও সমস্ত দিন বসে থাকি না। কেবল আমার কথার জবাবটি পেলেই আমি আর তোমায় বিরক্ত করব না। বল, আমায় কেন তুমি ত্যাগ করছ,—আমার কি অপরাধ?"

"সে কথাটা বাবাকে জিজ্ঞেসা কর গে।"

"বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে যাব কেন? তিনিই বা এ কথার জবাব দিতে যাবেন কেন? আমার বাবা আমাকে সম্প্রদান করেছেন তোমার হাতে; গ্রহণ করেছ তুমি; ত্যাগ করছ তুমি; জবাবও তুমিই দেবে।"

বিনোদ আর কোন জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বাঁকা পথ ধরিল; কহিল, "তুমি এই বয়েসে এত পাকা পাকা কথা কোত্থেকে শিখলে? এ সব ত তোমার বয়সের উপযোগী কথা নয়!"

"বয়সের উপযোগী কথা না হতে পারে,—কিন্তু অবস্থার উপযোগী ত! কথায় বলে, 'যে মেয়ে সতীনে পড়ে, ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।' যে রকম অবস্থায় পড়িচি, তাতে এর চেয়ে আরও ঢের বেশী পাকা পাকা কথা কইতে পারি। তোমরা পুরুষ মানুষ আমাদের মেয়েমানুষের জাতকে যতটা বোকা ঠাওরাও, সত্যি সত্যি কিছু আর আমরা ততটা বোকা নই। কেবল মুখ বুজে সয়ে যাই বলে, তোমরা মনে কর আমরা ভারি বোকা। আমি সহজে বেশী কথা কই না। তার উপর, তোমার ভাব-গতিক দেখে মুখে ত প্রায় ওলোপ দিয়েই রেখেছিলুম। কিন্তু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুমিই মুখ ফোটাতে বাধ্য করচ। আজ আমাকে প্রাণের দায়ে কথা কইতে হচ্চে। আমার যথাসর্ব্বস্ব যেতে বসেচে—আজ কি আমি চুপ করে থাকতে পারি? বাপ-মা বল, শ্বশুর-শাশুড়ী বল, ভাই-বোন বল, টাকাকড়ি, গয়না-গাঁটি বল,—তোমার চেয়ে বড় আমার

কেউ নয়। সেই তুমিই যখন আমাকে আমল দিতে চাচ্চ না,—একেবারে বিলেতে চলে যেতে চাচ্চ, তখন আমার আর রইল কি? গয়না? ছার গয়না! তুমি বল, এখনি আমি সব খুলে বার করে দিচ্চি;—কেবল তুমি আমাকে ত্যাগ কোরো না। ঝগড়াঝাটী নয়,—কিছুই নয়,—কালো বলে শুধু শুধু তুমি আমাকে ত্যাগ করবে কেন? তুমি বলচ—আমি ছেলে-মুখে বুড়ো কথা কইচি। কিন্তু তুমি কি এটাও জান না যে, আদর-অনাদর, স্নেহ-যত্ন কচি কচি দুধের ছেলে-মেয়েরাও বোঝে, কুকুর-বেরালেও বোঝে—আর আমি বুঝব না? বিয়ে অবিশ্যি আমাদের বেশী দিন হয় নি; কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যেও একদিনের জন্যেও কি তুমি আমাকে আদর যত্ন করে কাছে টেনে নিয়েছ? তুমি যে আমাকে কতখানি ভালবেসেছ, তাও কি আমি বুঝতে পারি না?"

"বুঝতে পেরে থাক, ভালই। সেই রকম বুঝে-সুঝে চোলো। যখন স্পষ্ট কথা জিজ্ঞেসা করলে, তখন স্পষ্ট কথা শুনে রাখ,—আমার প্রত্যাশা তুমি কোরো না।"

"এই তোমার শেষ কথা?"

"হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।"

"তা হলে ত আমার আর এখানে থাকা হয় না। আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

"তা' ত হয়ই না। তবে তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠাতে হবে না; তোমার বাপ আপনিই এসে তোমাকে নিয়ে

যাবেন। আর যেরকম অবস্থা দাঁড়াচ্চে, তা'তে অন্য কারণেও তোমার এখানে থাকা আর পোষাবে না। তোমার বাপও আর তোমাকে এখানে রাখতে চাইবেন না,—তিনি যে গোঁড়া হিঁদু!"

"তিনি হিঁদুই হোন, আর যাই হোন,—তিনি যখন কন্যাদান করেচেন, তখন তিনি নিজে হতে কখনই আমাকে নিয়ে যেতে চাইবেন না। তবে আমার আর এখানে থাকা হয় না বটে। তুমি যদি বিলেতেই যাও, তবে আমি কার কাছে থাকব? কি নিয়েই বা থাকব? পিসিমাও ত কাশী চল্লেন। কিন্তু আমিও বলে রাখছি,—আমি যদি সতী হই, আমি যদি কায়মনোবাক্যে তোমাকেই জেনে থাকি,—তবে যে কোন অবস্থাতেই হোক, একদিন তুমি আমাকে গ্রহণ করবেই করবে।" গভীর উত্তেজনায় সুলোচনার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; সে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"সে বেশ কথা। সেই আশার উপর নির্ভর করে বসে থাক। আজকের মত কিন্তু আমাকে রেহাই দাও,—তোমাকে যোড় হাতে মিনতি করচি।"

সুলোচনা বিনোদের দিকে পিছন ফিরিয়া, বিছানার এক পাশে সর্ব্বাঙ্গে কাপড় ঢাকা দিয়া, শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

৯

রস্থলপুর ছোট সহর হইলেও, সেখানকার হিন্দু অধিবাসী-দের মধ্যে পল্লী-স্বভাবের অভাব ছিল না। পরিণত বয়সে বিধুভূষণের বিধবা বিবাহ করার মত মুখরোচক সংবাদে, স্থতরাং, অনেকেরই দুই কস বাহিয়া লাল গড়াইতেছিল। সেখানকার হিন্দু সমাজে এমন 'সেনসেসন্যাল' ঘটনা পূর্ব্বে আর কখনও ঘটিয়াছিল বলিয়া কাহারও স্মরণ হয় না। অধিকন্তু বিধুভূষণ গোঁড়া হিন্দু বলিয়াই সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী,—সেখানকার স্থায়ী অধিবাসীও নহেন; এবং পদমর্য্যাদায় স্থানীয় অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। বিশেষতঃ, উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী বলিয়াই হউক, অথবা, স্বভাবতঃ অসামাজিক বলিয়াই হউক, সমাজে বড় একটা মিশিতেন না। সেইজন্য আন্দোলনের ঢেউটা তাঁহার নিকটে বেশী পৌঁছিতে পারে নাই। তবে লোকে একেবারে নিশ্চিন্তও ছিল না। কেবল আপনাআপনি আন্দোলন করিয়াই তাহারা সমস্ত উৎসাহ, উত্তেজনার অবসান করিয়া দেয় নাই। সরাসরি তাঁহার নাগাল ধরিতে না পারিয়া, তাঁহাকে একঘরে করিয়া তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিবার স্থযোগ না পাইয়া, তাহারা যে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া ছিল, এমন মনে করিলে তাহাদের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। ডিষ্ট্রীক্ট জজের কাছে তাঁহার বিরুদ্ধে বেনামী দরখাস্ত স্তূপীকৃত

হইতেছিল; এবং তাঁহাকেও তাহার ঠেলা কিছু কিছু সহ্য করিতে হইতেছিল। সেইজন্য তিনি তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন, এবং সে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াও আসিয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার অবস্থা যাহাই হউক, হারাধন উকীলের অবস্থা তাঁহার ন্যায় ততটা নিরাপদ ছিল না। হারাধন রায় ওকালতী ব্যবসায় উপলক্ষে রসুলপুরে অনেক দিন ধরিয়া বাস করিতেছিলেন, এবং সেখানকার একরূপ স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সকলেই একটু ভয় করিয়া চলিত। শুধু বড় উকীল বলিয়া নহে, তাঁহার ন্যায় কূটবুদ্ধি লোক সে অঞ্চলে আর একজনও ছিল না বলিলেও চলে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মিথ্যা মামলা সাজাইতে, মিথ্যা সাক্ষী তৈয়ার করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মোকদ্দমার ফেরে ফেলিয়া লোককে হয়রান করিতে তাঁহার যুড়া ছিল না। কেহ কোন কারণে একবার তাঁহার বিরক্তিভাজন হইলে, আর তাহার রক্ষা ছিল না। এ সকল কাজই কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির মারফতে সম্পন্ন হইত। এইরূপ কোন মিথ্যা মামলার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও কেহ প্রমাণ করিতে পারিত না; অথচ সকলেই মনে মনে আসল কথাটা বুঝিত পারিত। এইরূপে, রসুলপুরের সমাজে তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল। লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি না করুক, ভয় করিত। তথাপি এমন একটা সরস অথচ গুরুতর ব্যাপারে তিনিও সামাজিক আন্দোলনের হাত হইতে একেবারে

নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এবং তাঁহার ভগিনীর নামের সহিত বিধুভূষণের নাম জড়াইয়া ছড়া ও গান বাঁধা হইয়াছিল; এবং উকীল মহলে একটু প্রকাশ্য ভাবে ঘোঁটও চলিতেছিল। এ সকল কথা যে তিনি বা বিধুভূষণ জানিতেন না, এমন নহে; কিন্তু এই কথা লইয়া বেশী উচ্চবাচ্য করা বিধুভূষণ বা হারাধন কাহারও ইচ্ছা ছিল না। তাঁহারা উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন কারণে কিল খাইয়া কিল চুরি করিতেছিলেন। অবশেষে কিন্তু একদিন এই অপ্রীতিকর আন্দোলন আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। একটা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল।

সে দিন ছিল শনিবার—বিনোদলালের কলিকাতা যাত্রার দিন। কিন্তু সে দিন ঘটনা-চক্রে তাহার কলিকাতা যাত্রায় বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইল।

মধ্যাহ্ন আহারের পর বিনোদ তাহার দুই একটী বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইতে গিয়াছিল; কিন্তু কাহারও দেখা না পাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। পথের ধারে জয়গোপাল দত্তের বাড়ী। তাহারই বৈঠকখানা হইতে বহু-কণ্ঠ-মিশ্রিত উচ্চ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। সেই হাস্যধ্বনির মাঝখানে বিনোদ সহসা তাহার পিতার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সে শুনিল, তাহার পিতা ও হারাধন রায়ের ভগিনীর নাম এক সঙ্গে জড়িত হইয়া, অতি কুৎসিত ভাষায় আলোচনা চলিতেছে। বিনোদ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে

লাগিল,—একজন বলিতেছিল, "আরে রেখে দাও তোমার সৎসাহস। ও সব ছেঁদো কথায় আজকাল আর কেউ ভোলে না। অমন তোফা মাল পেলে আমরাও ঢের সৎসাহস দেখাতে পারি। অমন সুন্দরী, পূর্ণ যুবতী, আর তার সঙ্গে অতটা বিষয়,—বুঝ্‌লে কি না,—আমরা একটা কেন, অমন দশ বিশটা বিধবাকে বিয়ে করে ফেলতে পারি।" আর একজন প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, দেশে এত লোক থাক্‌তে, ছুঁড়ীটা ঐ বাহাত্তুরে বুড়োটাকে কি বলে পছন্দ করলে? আর বুড়োরেই বা কি আক্কেল! অমন সোমত্ত ব্যাটা-বৌ বর্ত্তমান; তার উপর তোর এই বয়েস—যমের বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়ে রয়েছিস; তোর বরং বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করাই উচিত। তোর এ বুড়ো বয়সে এ ধেড়ে রোগে ধরল কেন? তায় আবার বিধবা!"

আর একজন জবাব দিল, "আরে ভায়া, এখানে পছন্দ অপছন্দের কথা হচ্চে না,—এটা একটা পলিসি,—ডিপ্লোম্যাসী যাকে বলে। আসলে এটা হচ্চে হারাধন উকীলের কারসাজি! ব্যাটা কি কম ধড়িবাজ! বোনের টোপ ফেলে ব্যাটা বুড়োকে ঠিক গেঁথেচে। ঐ বোনটাই কি কম? এটা নিয়ে কটা হোলো, তার হিসেব রেখেছিস?"

বিনোদ আর শুনিতে পারিল না; সে ঝড়ের মত ছুটিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াই, সামনে যাহাকে পাইল, তাহাকে সজোরে এক ঘুসি কসাইয়া দিয়া কহিল, "খবর-

দায়! তোমরা আর এ বিষয়ের আলোচনা কর্‌তে পাবে না।"

যে যুবক ঘুসি খাইয়াছিল, তাহার নাম সুধীর। অতর্কিত ভাবে অকস্মাৎ ঘুসি খাইয়া সে প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহার গায়ে জোর কম ছিল না; বরং সে নিকটবর্ত্তী কুস্তীর আখড়ার সর্দ্দার, এবং ডানপিটে বলিয়া তাহার একটু খ্যাতিও ছিল। বিস্ময়ের প্রথম বেগ কাটিয়া গেলে, সে পাণ্টা জবাবে বিনোদের নাকে এক প্রচণ্ড ঘুসি মারিল। সেই বজ্রমুষ্টির আঘাত সহ্য করা বিনোদের কর্ম্ম নয়। সে চিরদিন কলিকাতার মেসে থাকিয়া কেবল পড়াশুনাই করিয়াছে,—ব্যায়াম-চর্চ্চার ধার ধারিত না।

মূর্চ্ছিত অবস্থায় বিনোদকে গাড়ীতে তুলিয়া ঐ দলেরই দুই তিনটা যুবক তাহাকে তাহাদের বাড়ীতে আনিয়া হাজির করিয়া দিলে, বাড়ীর মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যুবকদের মধ্যে একজন বাড়ীর চাকর ভজহরিকে ডাকিয়া বলিল, "তোমাদের বিনোদ বাবু রাস্তায় মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গিয়ে, নাকে ভয়ানক লেগেছে; তাই ইনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। এঁর জন্যে একটা বিছানা কোরে দাও, এঁকে শুইয়ে দিয়ে যাই।" এই বলিয়া দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষার পর রক্তস্রাব বন্ধ হইলে, যুবকেরা ভজহরিকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। ইতোমধ্যে বিধুভূষণ

সংবাদ পাইয়া কাছারী হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং ঘটনাটার সংবাদ সহরময় ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। ডাক্তারের চেষ্টায় বিনোদের জ্ঞান সঞ্চার হইলে, বিধুভূষণ ও পিসিমা উভয়েই তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "কেমন করে পড়ে গেলি? কোথা পড়লি?" এই প্রশ্ন শুনিয়া বিনোদ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কে বল্লে আমি পড়ে গেছি?" "দু'জন ছেলে তোকে গাড়ী করে বাড়ীতে দিয়ে গেল—তারাই বলে গেল, তুই মুখ থুবড়ে পড়ে গেছলি; তাই নাক ছেঁচে গিয়ে এত রক্তপাত হয়েচে যে, তুই অজ্ঞান হয়ে গেছলি।" বিনোদ হাসিয়া কহিল, "পড়ব কেন? তারা মিছে কথা বলেচে।" "তবে নাক ছেঁচলি কেমন কোরে?" "তাদের দলের একজনের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল!" এইবার বিধুভূষণ ও পিসিমার আশ্চর্য্য হইবার পালা। কারণ, বিনোদ স্বভাবতঃ অত্যন্ত শান্ত-প্রকৃতির; এবং কলহ-বিবাদে একেবারেই পটু নয়। অথচ সে যখন নিজেই বলিতেছে যে সে মারামারি করিয়াছে, তখন সে কথা অবিশ্বাসও করা যায় না। কিন্তু বিশেষ গুরুতর কারণ ব্যতীত সে যে শুধু শুধু মারামারি করিতে যাইবে, ইহাও সম্ভব নয়। কিন্তু, কেন সে মারামারি করিতে গেল, কে তাহাকে এমন প্রহার করিয়া রক্তপাত করিল,—এই সকল প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলেও, সে কোন কথাই প্রকাশ করিল না। সে কেবল বলিল, "মার খেয়েচি, তাতে আমার দুঃখু নেই; কারণ,

আমিই আগে মেরেচি। আর, যে জন্যে মেরেছি, সে কারণটাও খুব ন্যায়সঙ্গত। এতে যদি দু'ঘা' মার খেতে হয়, তাতে ত দুঃখের কথা কিছু নেই।"

কিন্তু বিনোদ কোন কথা প্রকাশ করিতে না চাহিলেও, কথাটা একেবারে গোপনও রাহল না। কথায় আছে, মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণে প্রবেশ করিলে, তাহা আর গোপন রাখা ভার। এ ক্ষেত্রে আট দশটি যুবকের সম্মুখে যে ঘটনা ঘটিল, তাহা যে সুতরাং গোপন থাকিতে পারে না, ইহা ত স্বাভাবিক। সুধীর এবং তাহার দলের ছোকরারা প্রতি মুহূর্ত্তেই আশা করিতেছিল যে, এই ঘটনা উপলক্ষে একটা ফৌজদারী না হইয়া যায় না; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইল। অধিকন্তু, তাহারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল যে, বিনোদ মারা এবং মার খাওয়ার কথা বাড়ীতে স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু মারামারির কারণ, কিম্বা কাহারও নাম প্রকাশ করিতে চাহে নাই। সুতরাং শ্রাদ্ধ আর অধিকদূর গড়াইল না। তবে এই ক্ষুদ্র ঘটনার একটা 'মর‍্যাল এফেক্ট' এই হইল যে, এরূপ ভাবে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনা কিছু কম পড়িল।

১০

শ্রীমান্ হারাধন রায়ের পেশা ওকালতী; পসার যথেষ্ট; উপার্জ্জনও প্রচুর। সংসারে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা, বিধবা ভগিনী

প্রভাবতী; পত্নী বিমলা এবং দুই তিনটি শিশু পুত্র-কন্যা। তাঁহার আদিনিবাস রসুলপুর নহে। ওকালতী ব্যবসায়-সূত্রে তিনি এখানে সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে এখানে স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছেন।

হারাধন এবং বিধুভূষণ এক গ্রামের অধিবাসী, একই শ্রেণীতে বরাবর অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন। সেইজন্য উভয়ের মধ্যে, এবং এই দুইটী পরিবারেও, বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একসঙ্গে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে দুই-জনেই রসুলপুরে থাকিয়া ওকালতী ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। হারাধন বিধুভূষণের অপেক্ষা চতুর ছিলেন; তিনি অল্প দিনের মধ্যে বেশ পসার করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বিধুভূষণ ওকালতীতে তেমন সুবিধা করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুরুব্বীর জোর ছিল; তিনি চেষ্টা করিয়া একটা মুন্সেফী চাকরী যোগাড় করিয়া লইলেন। সেই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল। পরে বিধুভূষণ চাকুরীসূত্রে বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া পদোন্নতি লাভ করিতে করিতে অবশেষে সবজজের পদে উন্নীত হইলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে রসুলপুরে তাঁহার প্রথম কর্ম্মস্থলে বদলী হইলেন। হারাধন বরাবর রসুলপুরে থাকিয়া প্র্যাকটিস করিতেছিলেন। এখন তিনি সেখানকার একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এবং অন্যতম প্রধান উকীল। বিধুভূষণ

রসুলপুরে বদলী হইয়া আসায় দুই বাল্যবন্ধুর পুনর্মিলন হইল। ইহাতে উভয়েই আনন্দিত হইলেন।

বাল্যকালে গ্রামে বাস করিবার সময়ে হারাধন ও বিধুভূষণ পরস্পরের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। এক গ্রামের অধিবাসী এবং প্রতিবাসী বলিয়া উভয়েই পরস্পরের পরিবারেও সুপরিচিত ছিলেন। শৈশবে হারাধন বিন্ধ্যবাসিনীকে নিজের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। বিধুভূষণ প্রভাবতীকে জন্মিতে দেখিয়াছেন, ছেলেবেলা কত কোলে পিঠে করিয়াছেন। সে হারাধনকে যেমন দাদা বলিত, বিধুভূষণকেও তেমনি দাদা বলিয়াই ডাকিত। তাঁহার কোলে উঠিয়া কত আবদার করিত। তিনিও তাহাকে কত খেলানা, পুতুল দিতেন। সে বড় হইলে, তাহাকে বই, ছবি আনিয়া দিতেন।

ক্রমে হারাধন ও বিধুভূষণ কলেজে পড়িবার জন্য গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় গমন করিলেন; এবং লেখাপড়া শেষ করিয়া চাকুরীতে ঢুকিলেন। প্রভাবতীরও বিবাহ হইল; সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। কার্য্যগতিকে উভয়ের মধ্যে ১২।১৩ বৎসর আর দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না।

বিধুভূষণ রসুলপুরে বদলী হইয়া আসিলে, যেমন বাল্যবন্ধু হারাধনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সেইরূপ হারাধনের বাটীতে যাতায়াত করিতে করিতে, প্রভাবতীর সহিতও পূর্ব্বেকার ঘনিষ্ঠতা আবার ফিরিয়া আসিল।

প্রভাবতীকে বেশী দিন শ্বশুর-ঘর করিতে হয় নাই। বিবা-

হের পর এক বৎসর মধ্যে সে বিধবা হয়। ইহার মধ্যে সে দুই তিন মাস মাত্র শ্বশুরবাড়ীতে বাস করিয়াছিল। তাহার পর হইতেই এই বালবিধবা পিত্রালয়ে বাস করিতেছে। তাহার বয়স এখন পূর্ণ পঞ্চবিংশতি বৎসর।

হারাধন হতভাগিনী বিধবা ভগিনীর প্রতি স্নেহ-বিমুখ নহেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী বিমলা বিধবা ননন্দাকে তেমন প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না; উভয়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ প্রায়ই হইত। সে সকল গুলিরই যে উপযুক্ত কারণ থাকিত, তাহা নহে। অনেক সময়ে অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া, প্রায় অকারণে, অথবা অতি সামান্য কারণে কলহ হইত। প্রভাবতী হারাধনের নিকটে বৌয়ের নামে নালিশ করিয়াও কোন ফল পাইত না। বিচক্ষণ কূটবুদ্ধি হারাধন পারিবারিক কলহে বিধবা ভগিনীর অপেক্ষা গৃহিণীর পক্ষ সমর্থন করাই সুবিধাজনক ও সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ফলতঃ প্রভাবতী দাদার সংসারে বড় সুখে শান্তিতে ছিল না। এমন সময়ে এমনই অবস্থায় বিধুভূষণ রসুলপুরে বদলী হইয়া আসিয়া, হারাধনের বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন।

প্রথম প্রথম প্রভাবতী তাঁহার সাক্ষাতে বাহির হয় নাই, বা তাঁহার সহিত কথা কহে নাই। কিন্তু যাতায়াত করিতে করিতে ছেলেবেলাকার বিধুদাদার কাছে তাহার আর লজ্জা সঙ্কোচ রহিল না। দুই একটা পান কিম্বা এক গ্লাস জল দিবার সূত্রে হারাধনের সমক্ষেই উভয়ের মধ্যে একটু আধটু আলাপ চলিতে

লাগিল। ক্রমে হারাধন বাটীতে অনুপস্থিত থাকিলে, উভয়ের মধ্যে হারাধনের সাংসারিক কথাবার্ত্তাও কিছু কিছু চলিত। প্রভাবতী যে এখানে নিতান্ত কষ্টে আছে, ক্রমে তাহাও বিধুভূষণের অগোচর রহিল না। তিনি স্বভাবতঃই শৈশব-সঙ্গিনীর কষ্টে একটু আধটু সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিগৃহীতা, লাঞ্ছিতা, সহানুভূতির কাঙ্গালিনী প্রভাবতী বিধুভূষণের মুখে দুই চারিটা সহানুভূতির কথা শুনিয়া গলিয়া গেল, এবং একেবারে তাহার গোলাম হইয়া পড়িল।

বিধুভূষণের প্রতি প্রভাবতীর এই আনুগত্য অবশ্য হারাধন বা বিমলার অগোচর ছিল না। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই ইহাতে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বরং নানা সূত্রে পরোক্ষে প্রভাবতীকে উৎসাহই দিতে লাগিলেন। বিধুভূষণ আসিলে, হারাধন যদি সে সময়ে বাড়ীতে না থাকিতেন, তাহা হইলে বিমলা বিধু-ভূষণের অভ্যর্থনার জন্য, বিধুভূষণের বাল্যসখী বলিয়া প্রভাবতীকেই পাঠাইয়া দিতেন। প্রভাবতী কোন ওজর আপত্তি জানাইলে, বিমলা তাহাকে নানারূপে বুঝাইয়া, প্রবল যুক্তি প্রয়োগ করিয়া, তাহার সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিতেন। হারাধন বাড়ীতে থাকিলে, তিনিও নানা ফরমায়েস করিয়া ভগিনীকে বিধুভূষণের সমক্ষে আসিতে বাধ্য করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে পতি পত্নী পরস্পর কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই, এমন একই প্রণালীতে কার্য্য করিতে-

ছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

দুই বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল।

১১

প্রতিভা দেবীর শ্রাদ্ধের পরদিন জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ভোজন। বিনোদলাল জ্ঞাতি কুটুম্বদের লইয়া আহারে বসিয়াছে। সকলেই আশা করিতেছিলেন যে, বিনোদের পিতাও তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিবেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার জন্যও একখানি আসন খালি ছিল। সকলেই তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিলম্ব দেখিয়া কেহ কেহ হাঁক দিলেন, কেহ বা, গৃহস্বামীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য, পরিবেশক ও ভৃত্যদিগকে অনুরোধ ও আদেশ করিতে লাগিলেন।

একটু পরে বিধুভূষণ স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলেন। কহিলেন "আপনারা এখনও চুপ করে বসে রয়েছেন কেন, আরম্ভ করুন না।" ভোক্তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করচি।"

"আমি শুদ্ধ বসে পড়লে আপনাদের খাওয়ার তদারক করবে কে?"

গৃহস্বামীর এই আপত্তি মামুলী ধরণের আপত্তি মনে করিয়া অপর একজন মামুলী ভাবেই বলিলেন, "আমাদের খাওয়ার তদারক আবার কি—এ তো ঘরের কথা। নিন, আপনিও বসে পড়ুন।"

বিধুভূষণ কহিলেন, "আমার একটু দেরী আছে—আমার এখনও স্নান হয় নি, সন্ধ্যাহ্নিক হয় নি।"

তখন অনেকেই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এখনও স্নান হয় নি! বেলা ত কম হয় নি—দুটো বাজে যে! চিরকাল ঘড়ি ধরে নাওয়া খাওয়া অভ্যাস—এমন অনিয়ম করলে অসুখ করবে। যান, যান—শীগ্‌গির চান করে নিন গে—আমাদের জন্যে আপনাকে কিচ্ছু ব্যস্ত হতে হবে না। বিনোদ এখানে রইল—আর আমরা নিজেরাই সব দেখে শুনে নিচ্চি। আমরা তো আর পর নই।"

"সে আমি যাচ্চি—আপনারা আর আমার জন্যে অনর্থক বসে থেকে কষ্ট পাবেন না—আরম্ভ করুন।"

এ অনুরোধ আর দ্বিতীয়বার করিতে হইল না—বেলা বিলক্ষণ হইয়াছিল, কাজেই কেহ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গৃহস্বামীর উপদেশ পালনে তৎপর হইলেন।

বিধুভূষণকে আহার করিতে বসাইবার জন্য নিমন্ত্রিত-গণের পক্ষ হইতে উপরোধ অনুরোধ মামুলী হইতে পারে, কিন্তু বিধুভূষণের নিজের দিক হইতে আপত্তিটা নেহাত মামুলী নয়। তাহার একটা বিশেষ কারণ ছিল। তিনি নিজে যখন আহার করিতে বসিলেন, তখন সে কারণটা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

বেলা তখন প্রায় অপরাহ্ন। বিধুভূষণের স্নানাহ্নিক শেষ হইয়াছে। নিমন্ত্রিতগণের আহারাদি চুকিয়া গিয়াছে—

অনেকেই নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিয়াছেন। নিতান্ত আপনার দুই একজন তখনও বাহিরের ঘরে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া কহিলেন, "এইবার তোর ভাত দিতে বলি ?"

"বল। কিন্তু দিদি, আমাকে একটু নিরিবিলিতে ঠাঁই করে দাও।—নিরামিষ ভাত ব্যঞ্জন আছে ? আমায় যেন মাছ দিও না—আমি নিরামিষ খাব।"

বিন্ধ্যবাসিনী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "নিরামিষ ভাত ব্যঞ্জন আছে ; কিন্তু আজকের দিনে নিরামিষ খাবি—কি রকম কথা ?"

"হ্যাঁ দিদি। শুধু আজ নয়—আজ থেকে আমি বরাবরই নিরামিষ খাব।"

বিন্ধ্যবাসিনী অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "কেন, তুই কি বিধবা না কি ?"

"বিধবাই ত !"

"ও মা ! তুই বলিস কি রে ! বিধবা ত মেয়েমানুষেই হয় ! ব্যাটাছেলে আবার কবে, কোথায় বিধবা হোয়েচে ? ও মা ! এমন কথা ত কখনও শুনি নি বাবু !"

"কেন দিদি, স্বামী মরে গেলে যদি মেয়েমানুষ বিধবা হোতে পারে, তবে স্ত্রী মরে গেলে পুরুষ মানুষেই বা বিধবা হবে না কেন ?"

"ওমা, তুই যে আমাকে অবাক্ কর্‌লি বিধু! ব্যাটাছেলেতে আর মেয়েমানুষে! বলে, কিসে আর কিসে! চাঁদে আর জোনাকীতে!"

"না দিদি! এ তোমার বড় অন্যায় পক্ষপাত।"

"শুধু আমার অন্যায় কেন,—দেশশুদ্ধ লোক ত এই করচে। দেশ শুদ্ধ লোকই কি অন্যায় করচে?"

"করচে বই কি। মেয়েমানুষের বেলা এক নিয়ম, আর পুরুষমানুষের বেলা আর এক নিয়ম—এ অন্যায় নয় দিদি? এ রকম অন্যায় কেন হবে? নিয়ম সবাইকার পক্ষে সমান,—তা' কেবা জানে পুরুষমানুষ, আর কেবা জানে মেয়ে-মানুষ। দেখ দিদি! আমাদের এই রাজ্য যে নিয়মে চল্‌চে, সে নিয়ম যেমন প্রজারা মানে, রাজাও তেমনি সেই নিয়ম মানেন। যে নিয়ম একজন মানবে, আর একজন মানবে না—সে নিয়ম নিয়মই নয়—তাকে অনিয়ম বলতে পারো। মেয়ে-মানুষও মানুষ—পুরুষমানুষও মানুষ। তবে কেন দু'জনের আলাদা আলাদা নিয়ম হবে? স্ত্রী মরলে পুরুষ আবার তখনি বিয়ে করবে, মাছ মাংস খাবে, সব রকম সুখ ভোগ করবে, বিলাসে ডুবে থাকবে—তাতে কোন দোষ হবে না; আর স্বামী মরে গেলে মেয়েমানুষকে মরা মানুষের মুখ চেয়ে সব ত্যাগ কর্‌তে হবে—কেন? মেয়েমানুষকে যদি সব ত্যাগ করতে হয়, তবে পুরুষকেও সব ত্যাগ করতে হবে। বিধবা মেয়েমানুষকে যেমন আচারে থাকতে হবে,

—বিধবা পুরুষমানুষকেও ঠিক সেই রকম আচারে থাকতে হবে। পুরুষমানুষও আর বিয়ে করতে পাবে না, মাছ মাংস খাবে না, ভাল কাপড়-চোপড় পরবে না, কোন রকম সুখ ভোগ করবে না। তবেই ঠিক ধর্ম্মসঙ্গত কাজ হবে। আমিও সেই জন্যে আর মাছ মাংস খাব না, হবিষ্যি করব।"

বিন্ধ্যবাসিনী অবাক্ হইয়া গালে হাত দিলেন। প্রথমটা ত তিনি কথাই কহিতে পারিলেন না। অবশেষে একটু আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "কি জানি বাবু, তোদের আজকালকার এ সব কি মতিগতি হচ্চে! হিঁদুয়ানী আর রইল না।" বলিয়া তিনি রাগে গরগর করিতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতেই বিধুভূষণ যথার্থই বিধবার আচার ব্যবহার পালন করিতে লাগিলেন। অবশ্য এ সংবাদ রাষ্ট্র হইতে বেশী দিন বিলম্ব হইল না। শুনিয়া অনেকে অনেক রকম মত প্রকাশ করিলেন। কেহ বা মুচকি হাসিয়া কহিলেন, 'বুড়ো মিন্সের ঢং দেখ।' কেহ বা কহিলেন, 'কালে কালে কত রঙ্গই দেখতে হবে।' কেহ বা গম্ভীর ভাবে কহিলেন, 'ও দু'দিন। শেষ রক্ষে হলে হয়। দেখা যাবে, বুড়োর ছেনালী কত দিন বজায় থাকে।' আবার দুই একজনের, বিধুভূষণের প্রতি শ্রদ্ধায়, মস্তক নত হইয়া আসিল। তাঁহারা বলিলেন, 'ঠিক কথাই ত! উনি ত কিছু অন্যায় কাজ করেন নি। সত্যই ত,—স্ত্রী মরে গেলে স্বামীরও সংযত হয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা দরকার!"

বিধুভূষণ নিজে কিন্তু নির্ব্বিকার। স্তুতি-নিন্দা কোন কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া, তিনি আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

প্রতিভা দেবীর মৃত্যুর মাস দুই তিন পরে এক দিন এক-জন ঘটক চূড়ামণি বিধুভূষণের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিধুভূষণ প্রথমে মনে করিলেন, ঘটক মহাশয় হয় ত তাঁহার পুত্র কিম্বা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ আনিয়া থাকিবে। কিন্তু ঘটক মহাশয় যখন খোদ বিধুভূষণের বিবাহের কথা পাড়িলেন, তখন বিধুভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "আমার কি আর বিয়ের বয়স আছে? আমার ছেলের এইবার বিয়ে দেব।" ঘটক ঠাকুর তাহাতে নিরস্ত না হইয়া বলিলেন, "মেয়েটি বয়স্থা এবং সুন্দরী—আপনার সঙ্গে মানাইবে ভাল। মেয়ের বাপ-মারও খুব মত আছে।" ইহার পর তিনি, বিধুভূষণের যে এখনও বিবাহের বয়স যথেষ্টই আছে, বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে যে অতীব আবশ্যক, গৃহিণী বিনা যে গৃহ অন্ধকার, এবং অচিরে বিবাহ না করিলে বিধুভূষণের যে চরিত্র-দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা—এই সকল কথা বুঝাইবার জন্য নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করিলেন। তখন বিধুভূষণ খুব গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমি বিধবা—বিধবার কি আবার বিয়ে হয়!" ঘটক ঠাকুর তাহা ঠাট্টা মনে করিয়া, কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে গেলে, বিধুভূষণ পল্লীর দু'-একটী বালবিধবার নামোল্লেখ করিয়া বলিলেন, "উহাদের

আগে বিবাহ দাও; তার পর আমার বিবাহের কথা তুলিও।”

ঘটক মহাশয় বলিলেন, “তাও কি হয়। ওরা যে বিধবা; আর ওদের বাপ-মা-ই বা রাজী হবে কেন?” বিধুভূষণ একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “আমিও ত এই মাত্র বলিলাম, আমি বিধবা!” ইহার পর আর ঘটক মহাশয় কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না।

১২

হারাধনের বৃদ্ধ পিতা এখনও বর্ত্তমান। হারাধন কর্ম্মসূত্রে গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতে বাধ্য হইলে, কৃষ্ণধন রায় মহাশয় পুত্রের কর্ম্মস্থলে পরিবার লইয়া যাইবার প্রস্তাবে বাধা দেন নাই বটে, কিন্তু নিজে গ্রাম ছাড়িয়া, সাত পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতে রাজী হন নাই। এবং এ যাবৎ এক দিনের জন্যও পুত্রের কর্ম্মস্থলে আগমন করেন নাই। কিন্তু আর তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা স্থির থাকিল না। রসুলপুর হইতে ক্রমাগত তাঁহার পুত্র-কন্যার সম্বন্ধে বেনামী চিঠিতে এমন সকল সংবাদ আসিতে লাগিল যে, বৃদ্ধ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া, একদিন বিনা এত্তেলায় পুত্রের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর; হারাধন কাছারীতে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অস্নাত, অভুক্ত। চাকর-বাকরেরা রসুলপুরেরই লোক; তাহাদের

কেহ কৃষ্ণধনকে কখনও দেখে নাই। তিনিও কাহাকেও নিজের পরিচয় দিলেন না; অন্তঃপুরেও সংবাদ পাঠাইলেন না। পুত্রবধু বিমলা কিম্বা কন্যা প্রভাবতী কেহই তাঁহার আগমন সংবাদ পাইল না। তিনি কেবল হারাধন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন মাত্র।

রসুলপুর একটী বড় মহকুমা; এবং সেখানে হারাধনের পসার খুব। দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই, —মামলা মোকদমা সম্বন্ধে পরামর্শ লইবার জন্য সুদূর মফস্বলের পল্লীগ্রাম হইতে অনেকে হারাধনের বাড়ীতে আসিয়া থাকে। কাজেই চাকরেরা ততটা খেয়াল করিল না; কৃষ্ণধনকে সেইরূপ বাবুর দর্শন-প্রার্থী একজন মক্কেল ভাবিয়া, বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিয়া বৃদ্ধকে ভিতরে বসাইয়া রাখিয়া, আবার নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। অপরাহ্ন কালে হারাধন কাছারী হইতে বাসায় ফিরিয়া বৈঠকখানায় রুদ্রমূর্ত্তি পিতাকে দেখিয়াই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। প্রথমটা তিনি এমন চমকাইয়া উঠিলেন, যে, কিছুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না; আর তাঁহার হাত-পাগুলাও যেন নিজের নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া অসাড় আড়ষ্ট হইয়া রহিল। এমন কি, বহু কাল পরে পিতার দর্শন পাইয়াও, তাঁহাকে প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া লইয়া, কাছারীর ধড়া-চূড়া সমেত, হারাধন পিতার পদতলে প্রণত হইলেন। বাবুকে

কাছারী হইতে ফিরিতে দেখিয়া, আদেশের অপেক্ষায় ভৃত্যগণ কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—তাহারা প্রভুর ভাব গতিক দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

কৃষ্ণধন গম্ভীর মূর্ত্তিতে বসিয়া থাকিয়া পুত্রের মুখের দিকে এতক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। পুত্র তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইয়া মাথায় দিলে, তিনি তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন বটে. কিন্তু মুখে কিছুই বলিলেন না—তেমনি গম্ভীর ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

হারাধন উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ী থেকে কখন বেরিয়েছেন ?"

কৃষ্ণধন কহিলেন, "রাত সাড়ে তিনটের সময়।"

"এখানে কখন এসে পৌঁছুলেন ?"

"বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা।"

কৃষ্ণধনের চেহারা দেখিয়া হারাধনের আর বুঝিতে বাকী ছিল না যে, তাঁহার স্নান হয় নাই ; এবং স্নানাহ্নিক না করিয়া তিনি কখনও আহার করিতেন না, ইহাও তাঁহার অজানা ছিল না ; তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার স্নানাহার হোয়েচে ?"

"সে জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।"

"এঁ্যাঃ! এখনও আপনার স্নানাহার হয় নি।" এই বলিয়া হারাধন ক্রোধে অধীর হইয়া হাঁক দিলেন, "নারাণ!"

নারাণ ওরফে নারায়ণ হারাধনের খাস খানসামা। সে-ই কৃষ্ণ-

ধনকে প্রথমে আসিতে দেখিয়াছিল, এবং বৈঠকখানা ঘর খুলিয়া তাঁহাকে বসাইয়াছিল। হারাধনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া আগন্তুককে প্রণাম করিতে এবং তাঁহার পদধূলি লইয়া মাথায় দিতে দেখিয়াও ছিল। এবং এতক্ষণ বৈঠকখানার দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রমাদ গণিতেছিল। এখনও সে আগন্তুকের প্রকৃত পরিচয় জানে না। বাবুর দেশের বাড়ীতে কর্ত্তাবাবু বর্ত্তমান আছেন, ইহা সে জানিত। তবে ইনিই যে সেই কর্ত্তাবাবু, এ সন্দেহ এখনও তাহার মনে উদয় হয় নাই। তবে আগন্তুক যে বড় সামান্য লোক নহেন, তাহা সে প্রভুর ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল। প্রভুর প্রকৃতিও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। এক্ষণে প্রভুর সক্রোধ বজ্রগম্ভীর আহ্বানে কাঁপিতে কাঁপিতে হারাধনের সামনে আসিয়া হাজির হইল।

হারাধন তাহাকে দেখিয়াই ক্রোধে আরও জলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "হারামজাদা! বাবা বেলা এগারটার সময় থেকে এসে বসে আছেন,—আর তুই স্নানাহারের যোগাড় করে দিতে পারিস নি?"

বলিয়াই হারাধন নারায়ণকে প্রহার করিবার জন্য—সামনে পিতার ধূলি-মলিন উৎকল দেশীয় চটীজুতা যোড়াটা পড়িয়া ছিল—তাঁহারই একপাটি তুলিয়া লইলেন।

এই সময় বিস্মিত নারায়ণ কহিয়া উঠিল, "কর্ত্তাবাবু!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণধন গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "হারাধন!"

উদ্যত-চটি-হস্ত হারাধন পিতার দিকে মুখ ফিরাইলেন। ইত্যবসরে নারায়ণ আসিয়া, কৃষ্ণধনের পদতলে পড়িয়া, তাঁহার পদধূলি মাথায়, জিহ্বায় এবং সর্ব্বাঙ্গে মাথাইতে মাথাইতে বলিল, "আপনাকে আমি কখনও দেখি নি,—তাই চিন্তে পারি নি।" বলিয়া সে কৃষ্ণধনের পা জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। কৃষ্ণধন তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া, তাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তোমার কিছু ভয় নেই, তুমি ওঠ।"

বৃদ্ধের আশ্বাসবাণীতে একটু আশ্বস্ত হইয়া নারায়ণ ভীত নেত্রে হারাধনের মুখের দিকে চাহিল। হারাধন তখনও রাগে ফুলিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণধন পুত্রকে বলিলেন, "নারাণকে মারধর করবার দরকার নেই; ওর কোন দোষ নেই। ও ত আমাকে চিনত না। আর আমাকে ত কিছু অযত্ন করে নি। বরং ঘর খুলে দিয়ে বসিয়ে তামাক-টামাকও দিতে এসেছিল।"

কৃষ্ণধনের কথা মিথ্যা নয়। হারাধন রসুলপুরের একজন বড় উকীল। মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে কেবল রসুলপুর সহর নয়, সুদূর মফস্বল হইতেও বহু লোক তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিত। দীর্ঘকাল উকীল প্রভুর কাছে চাকুরী করিয়া হারধনের ভৃত্যবর্গের এ জ্ঞানটুকু বিলক্ষণ জন্মিয়াছিল যে, মক্কেলরা উকীলের লক্ষ্মী—তাহাদের অযত্ন করিতে নাই; এবং কে মক্কেল, কে নয়—তাহা যখন কাহারও গায়ে লেখা থাকে

না, তখন তাহারা আগন্তুক মাত্রকেই যত্ন করিয়া বসাইত—কি জানি, যদি কোন বড় মক্কেলই হ'ন।

কৃষ্ণধনের কথাটা সঙ্গত মনে করিয়া হারাধন একটু নরম হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটু উত্তপ্ত হইয়া কহিলেন, "কিন্তু দুপুরবেলা বাড়ীতে একজন ভদ্রলোক এসেছেন,—তাঁর খাওয়া দাওয়া হয়েছে কি না, সে খবরটাও ওর নেওয়া উচিত ছিল ত!"

"তা কেমন করে থাকবে। যাকে ও চেনে না,—কি মতলবে এসেছে জানে না,—তার সম্বন্ধে ও আর বেশী কি করতে পারে। তোমার কাছে ত রোজ এমন কত লোক যাওয়া আসা করে থাকে। ও আমাকে তোমার সেই রকম কোন মক্কেলই হয় ত মনে করে থাকবে।"

নারায়ণ খুব উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক কয়েছেন কর্ত্তাবাবু। আমি আপনাকে বাবুর মক্কেল ঠাওর করেছিলাম।"

হারাধন তখন পিতাকে কহিল, "আপনি কেন বাড়ীতে খবর দিতে বললেন না? পরিচয়ই বা দিলেন না কেন?"

কৃষ্ণধন বলিলেন, "তার কোন দরকার ছিল না। আমি ত এখানে থাকতে আসি নি—তোমার সঙ্গে দু'চারটে কথা কয়ে এখনই বাড়ী ফিরে যাব।"

"সমস্ত দিন অনাহারে রয়েছেন—আবার এখনি বাড়ী ফিরে যাবেন কি রকম!"

কৃষ্ণধন আরও একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তাই যেতে হবে। নারাণ, তুমি তা'হলে এখন যেতে পার—তোমার কাজ কর্ম্ম করগে। আর ত তোমার কোন ভয় নেই।"

হারাধন অনুমোদন করিয়া কহিলেন, "হাঁ, তুই বাড়ীর ভিতর খবর দিগে যা—বাবা এসেছেন।"

নারায়ণ আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, কৃষ্ণধন বলিলেন, "বাড়ীতে খবর দেবার কোন দরকার নাই। তবে তুমি তোমার নিজের কাজে যেতে পার।"

নারায়ণ কর্ত্তাবাবুর কথায় সায় দিয়া বলিল, "আজ্ঞে, তাই যাই।" আর প্রভুর আদেশ পালন করিবার জন্য অন্দর-মহলে প্রবেশ করিল।

নারায়ণ চলিয়া গেলে, কৃষ্ণধন হারাধনকে কহিলেন, "তুমি ভিতর থেকে কাপড় চোপড় ছেড়ে এস—তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

"কাপড় আমি ছাড়ব এখন, সে জন্যে কিছু এসে যাচ্ছে না। এখন আপনি কি স্নান করবেন, না, কাপড় চোপড় ছেড়ে হাত পা ধুয়ে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে আহারাদি করবেন?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "সে সব কিচ্ছু দরকার নেই।"

হারাধন বলিলেন, "তা কি হয়! ওরে ভর্ত্তু, এক গাড়ু জল আর একখানা গামছা নিয়ে আয়।"

ভর্ত্তু আসিল না—তাহার পরিবর্ত্তে গাড় গামছা হাতে

সরিয়া আসিল প্রভাবতী। ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল, "বাবা!"

বৃদ্ধ কোন উত্তর করিলেন না। দেখিয়া ভাই-বোন উভয়েই অতিমাত্রায় বিস্মিত ও আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। প্রভা কম্পিত কণ্ঠে আবার ডাকিল, "বাবা, আপনার পা ধোবার জল এনেছি।"

কৃষ্ণধন এবার গুরু গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভা, তুমি বাড়ীর ভিতর যাও। আমি পা ধুইব না, এখানে জল গ্রহণও করিব না। তোমরা কেহ ব্যস্ত হইয়ো না।" পরে হারাধনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হারাধন, তুমি এইখানে বস; আর চাকরদের মানা করে দাও,—কেউ যেন এদিকে না আসে।"

একে ত এমন ভাবে, এরূপ অসময়ে, পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়াই, অকস্মাৎ পিতার এ বাটীতে আগমন; তাহার উপর, পিতার ভাব গতিক দেখিয়া হারাধন উত্তরোত্তর ভীত হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রভাবতী ত এক ধমক খাইয়া বাড়ীর ভিতরে পলায়ন করিয়াছে। হারাধন পিতৃ নির্দ্দেশ মত নারায়ণকে ডাকিয়া, তাহাকে উপদেশ দিয়া, কিছু দূরে বসাইয়া রাখিয়া বৈঠকখানার দ্বার ভেজাইয়া দিয়া, পিতার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

পিতা-পুত্রে বহুক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইল। কি কথা হইল, তাহা জনপ্রাণীও টের পাইল না। তাহার ফল কিন্তু বড় চমৎকার হইল। আলাপ শেষে হারাধন সহাস্য মুখে ঘর

হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভৃত্যবর্গকে সেই অবেলায় পিতার স্নানের উদ্যোগ করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। কৃষ্ণধনেরও অপ্রসন্ন ভাব দূর হইল; স্নানাহারে তাঁহারও আর কোন আপত্তি রহিল না।

১৩

গুণই বলুন, আর দোষই বলুন,—বিনোদলালের স্বভাবটি কিন্তু বড় একগুঁয়ে। সে তাহার পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার ঐ সামান্য পুঁজি লইয়া মহাসাগরের পারে পাড়ি দিল। প্রথমে সে লণ্ডনের একটা হোটেলে গিয়া উঠিল; সেখানে একদিন থাকিতে তাহার যে খরচ পড়িল, তাহাতেই তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সেই দিনই সে সন্ধান করিয়া এপার্টমেণ্ট ভাড়া করিয়া তথায় উঠিয়া গেল। কিন্তু সেখানেও খরচ অত্যন্ত বেশী—তাই সে কোন গৃহস্থ ঘরে আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এবং অচিরে তাহা মিলিয়াও গেল।

সে এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর হইতে বরাবর জেনারেল এসেম্বলীজ ইনষ্টিটিউসনে (অধুনা স্কটিশ চার্চ্চেস কালেজ) পড়িয়া ছিল। পড়াশুনায় ভাল ছিল বলিয়া কলেজের পাদরী অধ্যাপকেরা তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। বিশেষতঃ বাইবেলের পরীক্ষায় সে প্রতি বৎসর প্রথম হইত। তাই তাহার প্রতি অধ্যাপকগণের ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের একটু পক্ষপাত

ছিল। এই সকল অধ্যাপকের অনেকের নিকট হইতে বিনোদ লাল বিলাত-যাত্রার প্রাক্কালে অতি সহজেই ভালরকম পরিচয়-পত্র যোগাড় করিতে পারিয়াছিল। সেই পত্রগুলা এখন তাহার খুব কাজে লাগিয়া গেল। তাহারই জোরে সে লণ্ডনের উপকণ্ঠে একটু পল্লীগ্রামের মতন স্থানে এক ভদ্র পরিবারে আশ্রয় লাভ করিল।

এই প্রেষ্টন পরিবারে মাত্র তিনটি লোক—কর্ত্তা, গৃহিণী ও তাঁহাদের যুবতী কন্যা এলিজাবেথ। গৃহস্বামী হেদুয়ার কালেজের একজন অধ্যাপকের অতি নিকট আত্মীয়। তাই বিনোদ তাঁহার বাসা খুঁজিতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র, তিনি আত্মীয়ের চিঠি পড়িয়াই তৎক্ষণাৎ বিনোদকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই দিন বিকালেই বিনোদ তাহার সামান্য ট্রাঙ্ক ও কাপড় চোপড়, বই প্রভৃতি লইয়া প্রেষ্টন পরিবারের বাটীতে উঠিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, ইহাদের সহিত বনাইয়া লইতে বিনোদের বেশী বিলম্ব হয় নাই। তাহার নম্র স্বভাব, মিষ্ট কথাবার্ত্তা, পড়াশুনায় গভীর মনোযোগে কর্ত্তা, গৃহিণী, দুহিতা তিনজনেই প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। এবং বিশেষ করিয়া একটী বিষয়ে এলিজাবেথ তাহার প্রতি সমধিক আকৃষ্টা হইয়া পড়িয়াছিল। বিনোদ পড়াশুনায় যেমন ভাল ছিল,—পড়াশুনায় যে সব ছেলে ভাল হয়, তাহাদের যে একটা সাধারণ দোষ থাকে,—বিনোদও সে দোষ হইতে মুক্ত ছিল না;—সে কখনও নিজের শরীর বা

জিনিসপত্রের যত্ন লইতে শিখে নাই। তাহার বেশভূষা বিশৃঙ্খল, কাপড়-চোপড় ইতস্ততঃ ছড়ানো; তাহার বই কেতাব যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। বাড়ীতে তাহার মা ও পিসিমা এ সকল খোঁজ-খবর করিতেন। কলিকাতার মেসে বা অপর কোথাও তাহার এ সকল বিষয়ের তদারক করিবার কেহ না থাকায়, তাহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। প্রেষ্টন পরিবারের বাড়ীতে বিনোদের এই ত্রুটি—এই অপটুত্ব সর্ব্ব প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এলিজাবেথের। সে দুই একদিন দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না। সে নিজে খুব গোছালো মেয়ে—গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্মে মাকে অনেকটাই সাহায্য করিত। কোথাও নোংরা বা বিশৃঙ্খল অবস্থা তাহার দৃষ্টিতে অত্যন্ত কটু বোধ হইত। তাই সে একদিন অনুযোগের সহিত স্নেহ মিশাইয়া বিনোদের কাপড় চোপড় বই প্রভৃতি গোছাইয়া দিয়া গেল। যে ঘর বিনোদ পাইয়াছিল, সে ঘরে তাহার ব্যবহারযোগ্য সমস্ত আসবাব গৃহস্বামীই প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং এলি-জাবেথের সুনিপুণ হস্তক্ষেপে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘরখানি যেন হাসিতে লাগিল। গোছানো হইবার পর, এলিজাবেথ বিনোদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সুশৃঙ্খলতার সম্বন্ধে অযাচিত ভাবে কতকগুলি উপদেশ দিতেও ছাড়িল না।

কিন্তু শুধু মিষ্ট কথায় বা নম্রব্যবহারে তাহার পক্ষে বরাবর গৃহস্বামীর স্নেহ ভালবাসা পাইবার দাবী করা চলিল না। 'ইন্'এ ভর্ত্তি হইতে, বইটই কিনিতে এবং সমস্ত গোছগাছ করিয়া

লইতে তাহার সামান্য পুঁজি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তাহার পিসিমা তাঁহার প্রতিশ্রুতির অধিক করিয়াছিলেন— বিনোদ বিলাতে পৌঁছিবার পর হইতেই তিনি প্রতি মাসে তাহাকে পূরা একশত টাকা পাঠাইয়া দিতেছিলেন। কিন্তু গৃহস্থ-ঘরে 'বোর্ডার' রূপে থাকিয়াও বিনোদের মাসিক একশত টাকায় কুলাইত না—সে পুঁজি হইতে অবশিষ্ট টাকা দিয়া তাহার প্রাপ্য শোধ করিতে লাগিল। এইরূপে মাস তিন চারের মধ্যেই পিসিমার প্রদত্ত একশত টাকা ছাড়া তাহার আর কোন সম্বলই রহিল না। এইরূপ অবস্থায় সে প্রথম যে একশত টাকা পাইল, তাহা গৃহস্বামীকে দিয়া বাকী টাকা পরে দিবার প্রতিশ্রুতি করিয়া আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভ করিল। সে আশা করিয়াছিল, কোনরূপ কাজের যোগাড় করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া তাহার বিলাত-প্রবাসের ব্যয় চালাইয়া লইতে পারিবে। কারণ, কলিকাতা হইতে বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে সে যে সকল বিলাত-ফেরত বন্ধুর পরামর্শ লইয়াছিল, তাঁহাদের কেহ কেহ এরূপ আভাস দিয়াছিলেন যে, চেষ্টা করিলে এরূপ দুই একটা কাজ পাওয়া যায়; এবং পূর্ব্বেও দুই একজন বাঙ্গালী ছাত্র এইভাবে তাহাদের বিলাতে প্রবাসের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, পড়াশুনা শেষ করিয়া 'মানুষ' অর্থাৎ ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন দুই চারিজনের নামও তাঁহারা বিনোদের কাছে উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিনোদ এরূপ কোন কাজেরই যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিল না। এইরূপ চেষ্টা

করিতে করিতেই এক মাস কাটিয়া গেল,—কোন ফল লাভ হইল না। মাসান্তে যথারীতি পিসিমার প্রদত্ত টাকা আসিল। সেই টাকা সে গৃহস্বামীকে প্রদান করিল। কিন্তু পূর্ব্ব মাসের বক্রী দেনা সে শোধ করিতে পারিল না। এ মাসের পূরা টাকা দেওয়া হইল না। গৃহস্বামী মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ-ভাব বড় প্রসন্ন নহে বলিয়া বিনোদের বোধ হইল। বিনোদ নিজেকে বড় বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল। এখন সে করে কি! পিতার কথায় উপেক্ষা করিয়া সে যে অসমসাহসিক কার্য্যে নামিয়া পড়িয়াছে, এখন সেজন্য ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে অনুতাপ জন্মিতে লাগিল। বিলাত-প্রবাসী যে সকল বাঙ্গালী এবং তাহার সমবয়স্ক ও সমশ্রেণীর ছাত্রের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের কাহাকে কাহাকেও তাহার প্রকৃত অবস্থা খুলিয়া বলিয়া সে উপদেশ চাহিয়াছিল,—তাহাতেও কোন ফল ফলে নাই। এমনি বিপন্ন অবস্থায় বিনোদ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে ভগবান বিনোদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

১৪

"মিঃ মোকার্জ্জি, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে—মিস্ বেথসি!"

বিনোদের কক্ষের দরজার বাহির হইতে এলিজাবেথ ওরফে বেথ্সী প্রশ্ন করিল; আর ভিতর হইতে জবাব দিল বিনোদ।

কথাবার্ত্তা অবশ্য ইংরেজীতেই হইতেছিল। আমরা পাঠক পাঠিকাগণকে বাঙ্গলায় তাহার মর্ম্মটুকু মাত্র শুনাইতেছি।

দ্বার খুলিয়া বেথসি কক্ষে প্রবেশ করিতে না করিতে, বিনোদ তাহার পূর্ব্ব কথার টান ধরিয়া বলিয়া চলিল, "তুমি আমার ঘরে আসিবে তার আবার অনুমতি লওয়া কি। আমি তোমার ছোট ভাই (এটা সে জোর করিয়া বলিত—বস্তুতঃ এলিজাবেথ বয়সে তাহার অপেক্ষা চারি বৎসরের ছোট)—যখনই তোমার ইচ্ছা হইবে, তখনই তুমি আসিবে—অনুমতি লইতে হইবে না। আমাদের দেশে এত আড়ম্বর—" বিনোদ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু বেথসি অর্দ্ধপথে তাহার সকল উৎসাহ দমাইয়া দিয়া অনুযোগের সুরে কহিল, "মিঃ মোকার্জ্জি, আপনি কি কিছুতেই শোধরাইতে পারিলেন না? কাল আমি আপনার ঘর গোছাইয়া দিয়া গেলাম; আবার আজই আপনি সমস্ত নোংরা করিয়া রাখিয়াছেন!" বলিয়াই এলিজাবেথ বিনোদের গৃহ-সংস্কারে প্রবৃত্তা হইল। এই সময়ের মধ্যে বিনোদ যত কথা কহিল, বেথসি তাহার কোনটা শুনিল, কোনটা শুনিল না;—কোনটার জবাব দিল, কোনটার দিল না। ইহার মধ্যে বিনোদের মনে পড়িয়া গেল, বেথসি এখন কি জন্য আসিয়াছে, সে খবরটা এখনও লওয়া হয় নাই। সে প্রশ্ন করিতেই, এবার আর বেথসির উদাসীন ভাব রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ সচেতন হইয়া, যে কাজটায় হাত দিয়াছিল, সেটা স্থগিত রাখিয়া বলিল, "ভাল কথা মনে পড়েছে—বাবা বলছিলেন

কি—" কথাটা পাড়িতে না পাড়িতেই বিনোদের চোখ, মুখ,—এমন কি কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুকাইয়া আসিল। সে বেথসিকে বাধা দিয়া, একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "আমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত নাই—একটা কাজের চেষ্টায় আছি ;—যেমন করিয়াই হউক আমি শীঘ্রই তোমাদের টাকা পরিশোধ করিতে পারিব বলিয়া আশা করি। তোমরা আর দু'চার দিন—" এবার বেথসি একটু অধীর ভাবে কহিল, "আপনি আমার কথাটা আগে সবটা ভাল করিয়া শুনুনই না মিঃ মোকাদ্দি! বাবা এখন আপনার কাছে টাকা চান নাই। তবে তিনি যা বলিতে বলিয়াছেন, সেটাও আপনার টাকা সম্পর্কীয় কথাই বটে। তবে তাহাতে আপনার উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। বরং আপনি যদি আমার সব কথা শুনেন, তাহা হইলে যথেষ্টই আনন্দিত হইবেন।"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনোদ বলিল, "বল ; আমি কাণ খাড়া করিয়া আছি।"

বেথসি বলিল, "আপনি কাজের চেষ্টায় আছেন বলিতেছেন ; আমি আপনার জন্য একটা সেইরকম কাজের সন্ধান আনিয়াছি।"

আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিয়া বিনোদ কহিল, "আমি সকল রকম কাজ করিতেই প্রস্তুত আছি।"

বেথসি কহিল, "আপনি যদি আমার প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে রাজী থাকেন, তাহা হইলে আপনাকে বাকী

টাকা ত দিতে হইবেই না—আপনি যে মাসে একশ' টাকা দিতেছেন, তাহাও আপনাকে পূরা দিতে হইবে না—পঁচাত্তর টাকা করিয়া দিলেই হইবে। আপনার পকেট খরচের জন্য আপনি কিছু কিছু রাখিতে পারিবেন।"

ইহার উত্তরে বিনোদ ইংরেজীতে যাহা বলিল, বাঙ্গালায় তাহার ঠিক অনুবাদ হইতে পারে না। তবে তাহার সার মর্ম্ম এই যে, এমন আনন্দের সংবাদে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু কাজটা কি?

বেথসি একটু হাসিয়া, একটু কাশিয়া, একটা ঢোক গিলিয়া, কোন রকমে বলিয়া ফেলিল, "আপনি আমাকে বাঙ্গলা পড়াইতে পারেন? আমি ইস্কুলে ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ, ল্যাটিন ও গ্রীক শিখিয়াছি। আমার ভারতবর্ষীয় দুই একটা ভাষা শিখিবার ইচ্ছা আছে —সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গলা। ভারতবর্ষ দেখিতে আমার বড় সাধ যায়। আমাদের যে আত্মীয় আপনাকে পরিচয়-পত্র দিয়াছেন, তিনি যখন ছুটী লইয়া ইংল্যাণ্ডে আসেন, তখন তাঁর মুখে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের কথা শুনিয়া শুনিয়া আমার এই তিন ভাষা শিখিতে খুব ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু আমি শিখিবার কোন সুবিধা করিতে পারিতেছি না। আপনি যখন বাঙ্গলা দেশের লোক, তখন আপনি আমাকে বাঙ্গলা শিখাইতে পারেন মনে করিয়া, আমি বাবাকে সে কথা বলিয়াছিলাম। তিনি রাজী হইয়াছেন, এবং আপনাকে এই কথা বলিতে বলিয়াছেন। তাই আমি এখন আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

আপনার মত কি? আপনি আমাকে বাঙ্গলা পড়াইতে পারিবেন কি?"

বিনোদ যে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া ছিল, সেই টেবিল চাপড়াইয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আলবৎ! শুধু বাঙ্গলা কেন, আমি তোমাকে সংস্কৃতও শিখাইতে পারিব।" বিনোদ সংস্কৃতও খুব ভাল রকম জানিত।

"পারিবেন? তাহা হইলে ত খুব উত্তমই হয়। যাই, আমি বাবাকে এই কথা বলিগে।" বলিয়া এলিজাবেথ তৎক্ষণাৎ পিতার নিকটে যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু বিনোদ তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল, "কিন্তু তোমার হাতের কাজ ত এখনও শেষ হয় নি।"

"ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ।" বলিয়া এলিজাবেথ গৃহ সংস্কারের বাকী কাজটুকু তাড়াতাড়ি শেষ করিতে লাগিল।

১৫

পড়াশুনা ছাড়া বিনোদের প্রাণে আর কোন সখ ছিল না বলিলেই হয়। কেবল একটী জিনিসে তাহার অতি প্রবল অনুরাগ ছিল। সেটী একটী বাঁশী। সে বাঁশী বাজাইতে বড় ভালবাসিত। এবং বিশেষ আন্তরিকতার সহিত সে বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিল। যে-কোন রকমের একটী না একটী বাঁশী তাহার জীবনের চিরসাথী ছিল। বিলাতে আসিবার সময়ে সে তাহার প্রয়োজনীয় অন্য জিনিস তত সংগ্রহ করুক আর নাই করুক, তাহার প্রিয় বাঁশীটি তাহার ট্রাঙ্কের ভিতর লইতে সে ভুলে নাই।

বিলাতে আসিয়া, নূতন অপরিচিত দেশে পদার্পণ করিয়া, প্রথম প্রথম সে তাহার বাঁশীটিকে বাহির করিতে সাহস করে নাই। ক্রমে যখন সে এ দেশের সঙ্গে একটু আধটু পরিচিত হইল, তখন সে একদিন তাহার বাঁশীটি বাহির করিল। কিন্তু বাড়ীতে বসিয়া বাজাইতে তাহার সাহস হইল না—পাছে তাহার বাঁশীর রবে বাড়ীর লোকে, কিম্বা প্রতিবাসীরা বিরক্ত হয়। তাই সে অবসরের ও সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল। অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যার সময়ে একটুখানি বেড়ানো তাহার চিরকালের অভ্যাস। বিলাতে আসিয়াও সে এই অভ্যাস ত্যাগ করে নাই; বরং এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার এই অভ্যাস থাকায়, তাহার বৈকালিক ভ্রমণের উৎসাহ বিলক্ষণ বাড়িয়াই গিয়াছিল। সে প্রত্যহ বেড়াইতে যাইবার সময় বাঁশীটি সঙ্গে লইয়া যাইত;—কোন একটী নির্জ্জন স্থান পাইলে—যেখানে বাঁশী বাজাইলে কাহারও বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই, এমন স্থান পাইলে—সে বাঁশী বাজাইবে। দুই চারি দিন ধরিয়া অনেক খুঁজিবার পর, সে তাহার বাসা হইতে কিছু দূরে, একটী ছোট পাহাড় ও হ্রদের ধারে, একটী নির্জ্জন স্থান আবিষ্কার করিল। সে দিকে লোকালয় বড় ছিল না;—স্থানটা সত্য সত্যই কতকটা নির্জ্জন বটে। দুই তিন দিন সে দিকে যাতায়াত করিয়া সে দেখিল, সে দিকে লোকের গতিবিধি খুবই কম—ক্কচিৎ কদাচিৎ তাহারই মত নির্জ্জনতাপ্রিয় দুই একটী লোক নির্জ্জনতার লোভে সে দিকে যাইত মাত্র।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিনোদ এক দিন তথায় একটী

স্থান মনোনীত করিয়া, সেখানে বসিয়া তাহার বাঁশীটি বাহির করিয়া তাহাতে ফুঁ দিল। বাঁশী বাজাইতে সে খুব যত্ন করিয়াই শিখিয়াছিল। তাহার ঐকান্তিক সাধনা নিষ্ফল হয় নাই। যে কোন রকমের বাঁশীর ভিতর দিয়া সে অপূর্ব্ব সুর বাহির করিতে পারিত। কোন বাঙ্গালী সুরজ্ঞ লোকে তাহার বংশীবাদন শুনিলে নিশ্চয়ই বলিতে পারিত, তাহার বাঁশী যথার্থ ই "কথা কয়"। তাহার নিজস্ব দুইটী বাঁশী ছিল। একটী দেশী সাধারণ তল্‌তা বাঁশের; আর একটী বিলাতী—ক্লারিওনেট। দুইটী দিয়াই সে অপূর্ব্ব সুর বাহির করিতে পারিত। ক্লারিও-নেটের সুর অপেক্ষাকৃত চড়া—তাহাতে শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে, এই ভয়ে সে আজ তাহার দিশী বাশের বাঁশীটি লইয়া আসিয়া-ছিল। মনের মতন জায়গা পাইয়া সে মহা স্ফূর্ত্তির সহিত তাহাতে ঝঙ্কার তুলিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সে বাঁশীতে একেবারে মজিয়া গেল;—এমন তন্ময় চিত্তে বাঁশী বাজাইতে লাগিল যে, যতদূর পর্য্যন্ত তাহার বাঁশীর রব গিয়াছিল, ততদূরের সমস্ত লোক—যদিও তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়—তাহার বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া যে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং একমনে তাহার বংশীবাদন শুনিতে লাগিয়া গিয়াছিল, তাহা সে টেরও পায় নাই।

প্রাণ ভরিয়া বাঁশী বাজাইয়া যখন তাহার বেশ একটু তৃপ্তি জন্মিল, তখন সে দম লইবার জন্য বাঁশীটি মুখ হইতে নামাইল। এতক্ষণে সে জানিতে পারিল, তাহার বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হইয়া

এতগুলি লোক সেখানে জমা হইয়াছে। বিনোদ একটু লজ্জিত হইল ; দুই চারিটা ক্ষমা প্রার্থনা সূচক কথা কহিতে গেল। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে দুই একজন সমঝদার ওস্তাদ ছিল ; তাহারা তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, সে এমন কিছু অন্যায় কাজ করে নাই যে, সে জন্য তাহাকে ক্ষমা চাহিতে হইবে। বরং তাহার বংশীবাদন-নিপুণতায় তাহারা খুসীই হইয়াছে।

সেদিনকার মত বংশীবাদন স্থগিত রাখিয়া বিনোদ বাসায় ফিরিবার জন্য উঠিল। দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে পুনরায় বাজাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সে তাহাতে স্বীকৃত হইল না ; যথেষ্ট বিনয়ের সহিত কহিল, অনেক দিনের পর আজ প্রথম বাঁশী বাজাইয়া সে কিছু ক্লান্ত হইয়াছে ; আজ তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হউক। সে অবসর পাইলেই মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাঁশী বাজাইবে। অগত্যা সেদিনকার মত সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন করিল। কিন্তু একজন বিনোদের সঙ্গ লইল। পথে যাইতে যাইতে সে বিনোদের পরিচয় লইল ; কোথায় বাসা তাহার সন্ধান করিল ; কি জন্য ইংল্যাণ্ডে আসা, সে খবর লইতেও ভুলিল না। লোকটার গায়ে পড়িয়া আলাপ করিবার চেষ্টা দেখিয়া, বিনোদের মনে প্রথমে একটু সন্দেহ হইয়াছিল ;—বিদেশ-বিভূঁই, কার মনে কি আছে কে জানে! কিন্তু সে লোকটি বিনোদের বংশীবাদন-নৈপুণ্যের অজস্র প্রশংসা করিয়া কহিল, বাঁশী শুনিয়া সে বড় খুসী হইয়াছে। তাহাদের

একটী কন্‌সার্টের দল আছে। সেই দলে বিনোদ যদি বাঁশী বাজায়, তাহা হইলে সে বিনোদকে খুব ভাল একটা চাকুরী করিয়া দিতে পারে। এই প্রস্তাব শুনিয়া তারক গাঙ্গুলীর স্বর্ণ-লতার বিধুভূষণের বাঁয়া, তবলা, পাখোয়াজ বাজানো এবং পাঁচালী ও যাত্রার দলে চাকুরীর কথা বিনোদের মনে পড়িয়া গেল। সে মনে মনে খুব খানিকক্ষণ হাসিয়া লইয়া কহিল, সে সুদূর ভারতবর্ষ হইতে সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিলাতে পড়িতে আসিয়াছে—কনসার্টের দলে বাঁশী বাজাইবার চাকুরী করিতে আসে নাই। লোকটা নাছোড়বান্দা—কোন ওজর শুনিতে চাহে না। কিন্তু কোন মতে বিনোদকে চাকুরী লওয়াইতে প্রবৃত্ত করিতে না পারিয়া, অবশেষে সে একদিন—একটী দিন মাত্র তাহাদের দলে সখ করিয়া বাঁশী বাজাইতে অনুরোধ করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল। বিনোদ কিছুতেই সে নিমন্ত্রণ এড়াইতে পারিল না—অগত্যা তাহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইল। তখন উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে কার্ড বিনিময় করিল। তার পর আবার দেখা সাক্ষাতের এন্‌গেজমেণ্ট, অর্থাৎ দিন, ক্ষণ, স্থান নির্দ্ধারিত হইলে, লোকটি বলিল, সে ঐ সময়ে বিনোদের বাসায় গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; এবং তাহার দলের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, কোন দিন কোন সময়ে কোথায় বিনোদকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে তাহা জানাইয়া যাইবে।

লোকটির নাম টমাস পীয়ারসন। তাহার যে কথা, সেই

কাজ। সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিনোদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিমন্ত্রণের কথাটা পাকা করিয়া গেল।

"মিঃ মোকার্জ্জি, এবেলা কি আপনার হাতে কোন জরুরি কাজ আছে?"

"কেন বল দেখি, মিস প্রেষ্টন?"

"না, তাই জিজ্ঞেস করছি। আপনার ত দেখতে পাই কেবল পড়া, আর পড়া, আর পড়া। আপনার যদি অবসর থাকে, তবে আজ আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাই।"

"কোথায়?"

"মিউজিক হলে। আপনি ত একদিনও আমাদের মিউজিক হল দেখেন নি?"

"তা' ত দেখি নি মিস প্রেষ্টন। সেখানে কি হয়?"

"গান বাজনা—কনসার্ট।"

মিউজিক হল!—কনসার্ট! কি সর্ব্বনাশ! আজ যে বিনো-দের মিউজিক হলে এনগেজমেণ্ট! সে যে সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে!

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, মিস এলিজাবেথ প্রেষ্টন বলিল, "আপনি কি আজ রাস্তার ধারে বড় বড় প্ল্যাকার্ড আঁটা দেখেন নি? আজ যে লণ্ডন সহর সেখানে ভেঙ্গে পড়বে। আজ না কি কোন ভারতবাসীর অপূর্ব্ব বাঁশী শোনানো হবে।

তেমন বাঁশী এদেশে কেউ না কি কখনও শোনে নি!" এই বলিয়া মিস প্রেইন তাহার পকেট হইতে একখানা সুন্দর হ্যাণ্ড-বিল বাহির করিয়া বিনোদের হাতে দিল। দুই চারি লাইন পড়িয়াই বিনোদ বুঝিল, এই মিউজিক হলে আজ তাহাকেই বাঁশী বাজাইতে হইবে। হ্যাণ্ডবিলের নীচে স্বাক্ষর রহিয়াছে, টমাস পীয়ারসন,—ম্যানেজার, গ্র্যাণ্ড মিউজিক হল। এ কি! এমন প্রকাশ্য ভাবে পেশাদার কন্সার্টের দলে সহস্র সহস্র দর্শকের সামনে তাহার বাঁশী বাজাইবার ত কথা ছিল না! একে সে অত্যন্ত লাজুক, মুখচোরা ছেলে। তার উপর অপরিচিত বিদেশে, অপরিচিত অজ্ঞাতচরিত্র লোকের সামনে! ছি! ছি! বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলে যে! তাহার স্বদেশে তাহার পক্ষে এ কাজ লোকের চক্ষে অতি নিন্দনীয় যে! বিনোদের মুখখানি চুণের মত সাদা হইয়া আসিল,—ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতে লাগিল।

বিনোদের মুখের ভাব দেখিয়া এলিজাবেথ ভয় পাইয়া গেল। কহিল, "আপনার কি কোন অসুখ করেছে? যদি অসুখ করে থাকে তবে যেয়ে কাজ নেই।"

"না মিস, তেমন কিছুই হয় নি।" এতক্ষণে বিনোদ একটু সামলাইয়া লইয়াছে। "হঠাৎ মাথাটা কেমন করে উঠ্‌ল। যাক্‌, সে জন্যে আপনি কিছু উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনারা কে কে যাবেন?"

"আমরা সকলেই যাব। বাবা, মা, আমি, আর আপনি।—আমাদের চারজনেরই বক্স রিজার্ভ হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমি ত আজ যেতে পারছি না মিস।"

"তা' হলে আপনার নিশ্চয়ই অসুখ করেছে। তা' আপনার যেয়ে কাজ নেই। আর আপনাকে দেখবার শোনবার জন্যে আমিও বাড়ীতে থাকব। বাবা আর মা যাবেন তা' হলে।"

"না—না, সেরকম কিছুই হয় নি আমার। তবে মিউজিক হলে অত লোকের গরমে একটু কষ্ট হোতে পারে, তাই যেতে চাইছি না। তা' ছাড়া, আমার একটা দরকারী এনগেজমেণ্ট আছে, আমি বাড়ীতেও ত থাকব না—আমাকেও এখনই বেরুতে হবে। আপনারা তিনজনেই যান—আমার সেবা-শুশ্রূষার কোন দরকার হবে না।"

"বড় দুঃখিত হলুম মিঃ মোকার্জ্জি।"

"না মিস, দুঃখিত হবেন না—আপনাদের সঙ্গে যেতে পারলুম না বলে' আমারই ত দুঃখিত হবার কথা; তা' আমি আর একদিন আপনাদের সঙ্গে মিউজিক হলে যেয়ে গান বাজনা শুনে আসব। আজ আগে থেকেই একটা এনগেজমেণ্ট আছে কি না।"

এলিজাবেথ বিনোদকে খুব সাবধানে থাকিবার উপদেশ দিয়া দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিল। বিনোদ তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া, টয়লেট সারিয়া, কাপড় চোপড় ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। যখন কথা সে দিয়াছে, তখন তাহা রাখিতেই হইবে। যখন কনসার্টওয়ালারা এত বড় একটা উদ্যোগ আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন সে না বাজাইলে কাজটা যে নিতান্তই গর্হিত

হইবে, তাহা সে সহজেই বুঝিয়াছিল। তবে এমন প্রকাশ্য ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া, এত লোক জমা করিয়া, তাহাকে দিয়া বাঁশী বাজানো হইবে, এরূপ অবশ্য কোন কথা ছিল না। সেইজন্য সে মনে করিল যে, এই ওজরে যদি সে বাজাইবার দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে

কনসার্ট হলে গিয়া সে টমাসের সঙ্গে দেখা করিল, এবং অনুযোগ করিল যে, এমন প্রকাশ্য ব্যাপার করা হইবে, এরূপ কোন চুক্তি তাহার সঙ্গে ছিল না। টমাস সে কথা অস্বীকার করিল না; কিন্তু কহিল, এখন আর পিছাইয়া যাওয়া চলে না। এখন যদি বিনোদ না বাজায়, তাহা হইলে দর্শকদের টিকিটের দাম ফেরত দিয়াও নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না—তাহারা হল ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে; এমন কি, তাহাদের প্রাণ লইয়া পলায়ন করাও দুষ্কর হইবে। বিনোদ ভয় পাইয়া গেল। কহিল, বাজাইতে তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে তাহার অনেক পরিচিত লোক থাকিতে পারে; তাহাদের সামনে বাজাইতে তাহার ঘোর আপত্তি। কিন্তু টমাস তাহাকে বুঝাইল যে, ভারতবাসী বাঁশী বাজাইবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়াছে—দর্শকেরা বংশীবাদক ভারতবাসীকে দেখিতে চাহিবে; দেখিতে না পাইলে মহা অনর্থ বাধাইবে। তবে একমাত্র উপায় এই আছে যে, বিনোদের বেশভূষার একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহাকে এমন ছদ্মবেশে সাজাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, তাহাকে লোকে দেখিতে পাইবে,

এবং ভারতবাসী বলিয়াও বুঝিবে ; অথচ, তাহার পরিচিত লোকেরা তাহাকে চিনিতে পারিবে না।

ইহার পর বিনোদ প্রোগ্রাম দেখিতে চাহিল। প্রোগ্রামে দেখা গেল, সর্ব্বপ্রথমে বিনোদকে বাঁশী বাজাইতে হইবে। তার পর ঐক্যতান বাদন, গান প্রভৃতি দুই চারিটা অনুষ্ঠানের পর শেষ দফায় আবার বিনোদের বংশীবাদন। সর্ব্বপ্রথমে বাঁশী বাজাইতে বিনোদের কোন আপত্তি নাই ; কিন্তু শেষের দফায় তাহার খুব আপত্তি আছে। সে শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। দর্শকেরা হল ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে তাহার পালা শেষ করিয়া প্রস্থান করিতেই হইবে। ম্যানেজার বিনোদের মত পরিবর্ত্তনের একটু আধটু চেষ্টা করিল। কিন্তু এ বিষয়ে বিনোদকে স্থিরসঙ্কল্প দেখিয়া কহিল, "আচ্ছা, প্রোগ্রাম একটু আধটু বদল করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। গোড়ায় সে কথা দর্শকদের বলিলে, তাহারা বিশেষ কোন আপত্তি করিবে না।"

যথা সময়ে বিনোদ তাহার পালা আরম্ভ করিল। ম্যানেজার তাহার বেশভূষার সামান্য একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া, চলনসই গোছের ছদ্মবেশ তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে লজ্জা, ভয় কাটাইয়া, লজ্জানিবারণের নাম স্মরণ করিয়া, বিনোদ বাঁশীটি হাতে করিয়া আসরে প্রবেশ করিল।

ম্যানেজার লোকটি ছিল যথার্থ গুণজ্ঞ। সে বিনোদের বাঁশের বাঁশী বাজানো শুনিয়াই বুঝিয়াছিল, লোকটা সত্য সত্যই

গুণী। আজিকার প্রোগ্রামে বিনোদকে প্রথমেই বাঁশী বাজাইতে দেওয়া,—কেবল সে ভারতবাসী বলিয়া নহে,—যথার্থই তাহার বাঁশী বাজাইবার শক্তি ছিল বলিয়া। টমাস যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই হইল। বিনোদের বংশীবাদন শুনিয়া দর্শকেরা স্তম্ভিত হইয়া গেল—আসর অল্পক্ষণের মধ্যেই জমিয়া গেল। সকলে নিস্তব্ধ ভাবে বিনোদলালের বংশীবাদন শুনিতে লাগিল। সমস্ত সভায় বিনোদের বংশীধ্বনি ছাড়া আর টুঁ-শব্দ নাই। বাঁশীতে সিদ্ধহস্ত বিনোদ দুই একবার ফুঁ দিতেই, তাহার সকল জড়তা কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার পালার প্রথম অংশ বেশ ভাল রকমেই উৎরাইল।

তাহার বাজানো শেষ হইলে, টমাস পীয়ারসন ষ্টেজে আসিয়া দর্শকদের বলিল, এই ভারতবাসী বংশীবাদক অদ্য কিছু অসুস্থ। সেইজন্য তিনি আজ তাঁহার সমস্ত সামর্থ্য দিয়া বাজাইতে পারেন নাই। কিন্তু টমাস বুঝিয়াছিল, শ্রোতারা আজ যাহা শুনিল, এমন তাহাদের অনেকে জীবনে কখনও শুনে নাই। তাহার কথা শুনিয়া শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া উঠিল, "না, না— চমৎকার! এন্‌কোর! এন্‌কোর!"

ম্যানেজার বলিল, এখন অন্য প্রোগ্রাম আছে। তার পর ইনি আবার বাজাইবেন। তবে ইঁহার দ্বিতীয় দফা বাঁজাইবার কথা সকলের শেষে—তাহা তিনি পারিবেন না; শরীর অসুস্থ বলিয়া তাঁহাকে একটু সকাল সকাল বিশ্রাম লইতে হইবে। তাই দরকার মত প্রোগ্রামের একটু আধটু ওলোট পালোট করিতে

হইতেছে। শেষেই হউক আর মাঝখানেই হউক, এই ইণ্ডিয়ান আরও একবার বাঁশীতে তাহার সুর সাধনা-কৌশল দেখাইবে—অসুখের ওজর করিয়া একেবারে ফাঁকি দিবে না—বুঝিয়া, দর্শকেরা আশ্বস্ত হইল। ইহাতে কেহ কোনরূপ আপত্তি করিল না।

দুই এক দফার পর বিনোদ অপর একটা বাঁশী লইয়া বাজাইল। এবার দর্শকেরা আরও মুগ্ধ হইল। ক্রমাগত এন্‌কোর, এন্‌কোর করিতে লাগিল। বার বার চায়ার্স দিয়া বাদককে উৎসাহিত করিতে লাগিল। এইরূপে পালা শেষ হইতেই, বিনোদ প্রস্থান করিল—সোজা একেবারে বাসায়।

১৭

বিনোদ বাসায় ফিরিবার খানিকক্ষণ পরে প্রেষ্টন পরিবার বাড়ী ফিরিলেন। এলিজাবেথ গাড়ী হইতে নামিয়া সরাসর বিনোদের ঘরে আসিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছেন মিঃ মোকার্জ্জি? আপনার কোন অসুবিধা হয় নি ত?"

"কিচ্ছু না; আমি এখন বেশ ভালই আছি।"

"কোথায় যাবেন বলেছিলেন না? গিয়েছিলেন কি?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"এলেন কখন?"

"অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে।"

"আজ কিন্তু আপনি একটি আশ্চর্য্য জিনিসে বঞ্চিত হইলেন।

আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যেতে পারতেন, তা' হলে আমরা ত খুব খুসী হতামই ;—আপনিও দুঃখিত হতেন না, এ কথা জোর করে বলতে পারি। আপনার স্বদেশবাসীর বংশী-বাদ্য আপনি হয় ত অনেকবার শুনে থাকবেন,—সে জন্যে আপনার বিশেষ লোভ না থাক্‌তে পারে। কিন্তু আমরা যা শুনলাম, তাহা আপনারও অপ্রীতিকর হোতো না বলে মনে হয়। বিজ্ঞাপনে যে সকল কথা লেখা হয়েছে, তা' একটুও অতিরঞ্জিত নয়—লোকটি যথার্থই খুব ক্ষমতাবান। আচ্ছা, মিঃ মোকার্জ্জি, আপনার দেশের সকলেই,—অন্ততঃ অনেকেই কি খুব ভাল বাঁশী বাজাতে পারেন? আপনি নিজে বাঁশী বাজাতে জানেন কি?"

এলিজাবেথের বক্তৃতা শুনিয়া বিনোদ এতক্ষণ মনে মনে খুব হাসিতেছিল। কিন্তু এলিজাবেথের শেষের কথাগুলায় তাহার প্রতি সরাসরি আক্রমণ হওয়ায়, তাহার অন্তরের হাসি নিমেষের মধ্যে মিলাইয়া গেল। শেষের প্রশ্নটার কি জবাব দিবে, তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু জবাব একটা দেওয়া চাই ত। তাই আমতা-আমতা করিয়া কহিল, "আমাদের দেশের সবাই অবশ্য ভাল বাঁশী বাজাতে জানে না; তবে কেউ কেউ একটু আধটু জানে বটে। কিন্তু তা' হইলেও, তাদের কেহই সম্ভবতঃ আপনার দেশের লোকের মতন বাজাতে জানে না।"

"বলেন কি মিঃ মোকার্জ্জি! আমরা ত প্রায়ই মিউজিক হলে গিয়ে থাকি। কিন্তু আজ আপনার দেশবাসীর যে বাঁশী বাজানো শুনলাম, তা' আমি জীবনে কখনও শুনি নি; অবশ্য

আমার নিজের দেশ আর আমার স্বদেশবাসীকে আমি কম ভালবাসি না ; তবু সত্য কথা বলতে গেলে, আজ যা শুনলাম, আমার কোন দেশবাসী এ গৌরবের দাবী করতে পারবে না। শুনলাম, ইনি আবার বাঙ্গালা দেশের লোক। আপনি এঁকে চেনেন কি ?"

কথাগুলা আবার বাকা পথে আসিয়া পড়িতেছে,—কেবলি তাহার প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, ধরা পড়িবার ভয়ে বিনোদ কিছু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। কহিল, "চিনি কি না তা ত ঠিক বলতে পারছি না মিস। তবে কাল আমি আমার দেশবাসী বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।"

"আচ্ছা, মিঃ মোকার্জি, আমি প্রথমে আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম,—আপনি নিজে বাঁশী বাজাতে জানেন কি না—কই, সে প্রশ্নের ত আপনি কোন উত্তর দিলেন না ?"

এইবার বিনোদ মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেল। স্পষ্ট অস্বীকার করাও চলে না ; আবার স্বীকার করাও ত তেমন নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। কহিল, "জানি, সে অতি সামান্য।" তার পর প্রসঙ্গটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিল, "আমাদের দেশের এক দেবতা খুব ভাল বাশী বাজাতে পারতেন—এই কথা আমাদের শাস্ত্রে, পুরাণে লেখা আছে। তিনি এমন সুন্দর বাঁশী বাজাতেন যে, লোকে তাই শুনে প্রায় উন্মত্ত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসত।"

"ও, আপনি শ্রীকৃষ্ণের কথা বলছেন ?"

এইবার বিনোদ বিস্মিত হইল—সে বিস্ময় তাহার চোখে-

মুখে ফুটিয়া উঠিল। প্রশ্ন করিল, "আমাদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের কথা আপনি কেমন কোরে জানলেন ?"

"আমি ইম্পীরিয়াল ইনষ্টিটিউটে গিয়ে কোন কোন বইতে আপনাদের শ্রীকৃষ্ণের কথা পড়েছি। তিনি আপনাদের ম্যান-গড বা ডেমি-গড; তিনি মাঠে গরু চরাতে গিয়ে, রাখালদের সঙ্গে বাঁশী বাজিয়ে খেলা করতেন।"

এই এতটুকু মেয়ে! ইহার বয়স ত বেশী নয়! এই মেয়ে এত খবর রাখে! ইহার জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা এত বেশী! বিনোদ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "আপনি ত খুব পড়েন দেখছি। কখন সময় পান ? আমি ত আপনাকে গৃহকর্ম্ম করতেই বেশী সময় দেখে থাকি। ইহারই মধ্যে আপনি দেশ বিদেশের এত খবর নেবার সময় পান ? আবার খেলা-ধূলাও করেন দেখতে পাই। আশ্চর্য্য!"

"আশ্চর্য্য কিছুই নয়। রুটিন করে কাজ করলে সকল কাজই করবার সময় পাওয়া যায়। আপনাদের পুরাণ সম্বন্ধে যে সব ইংরেজী বই আছে, তা অতি সামান্য; পড়ে তৃপ্তি পাই না। লাইব্রেরীতে অনেক বাঙ্গলা বই আছে, অনেক সংস্কৃত ম্যানাস্ক্রিপ্ট পুঁথি আছে। আমি সে সব কিছুই জানি না,—কিছুই বুঝতে পারি না। সেই জন্য মনে বড় দুঃখ হয়। তাই ত আমি আপনার কাছে বাঙ্গলা আর সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেছি।"

এই মেয়েটির অধ্যয়ন-স্পৃহা দেখিয়া বিনোদ চমৎকৃত হইয়া

গেল। বুঝিল, এমন অদম্য স্পৃহা থাকাতেই সে তাহার পিতাকে রাজী করাইয়া বিনোদের বাসা খরচ এত কমাইয়া দিয়াছে। বলিল, "আমি আপনার বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শেখবার এমন প্রবল আগ্রহ দেখে যেমন আশ্চর্য্য হয়েছি, তেমনি সুখীও হয়েছি। আমি যতদূর জানি—তা' আমি আপনাকে খুব যত্ন করে শেখাব। আমি কতকগুলো বাঙ্গলা আর সংস্কৃত বই চাই। সেগুলো এখানকার কোন বইয়ের দোকানে পাই নি; তাই আমাদের দেশের এক বন্ধুকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে চিঠি লিখেছি। বইগুলি এসে পৌঁছলেই আপনার পড়ার আরও সুবিধা হবে।"

ধন্যবাদ দিয়া এলিজাবেথ কহিল, "আজ অনেক রাত হয়ে গেছে; আপনার শরীরও অসুস্থ, ক্লান্ত; আজ আর আপনাকে বেশী কষ্ট দিব না। আজ আমি চললাম। কিন্তু আপনি আপনার দেশের ঐ গুণবান ভদ্রলোকটির পরিচয় জানবার চেষ্টা করবেন। তাঁকে দেখবার, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার আমার খুব ইচ্ছা হয়েছে।" এই বলিয়া এলিজাবেথ নিজের ঘরে চলিয়া গেল। বিনোদও একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

১৮

পরের দিন প্রভাতে এক হাতে ব্রেকফাষ্ট ও অপর হাতে কতকগুলা সংবাদপত্র লইয়া এলিজাবেথ বিনোদের কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিনোদের উঠিতে একটু বেলা হইত

বলিয়া সে কর্ত্তা, গৃহিণী ও কন্যার সহিত ব্রেকফাষ্ট খাইত না—এলিজাবেথ রোজ সকালে আসিয়া তাহার ব্রেকফাষ্ট তাহার ঘরে দিয়া যাইত—আজও সেইরূপ আনিয়াছিল। আজ বেশীর ভাগ সংবাদপত্রগুলা ছিল। সে সকল সংবাদপত্রই লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী সংবাদপত্র। তাহাদের প্রত্যেকখানিতেই পূর্ব্ব রাত্রের মিউজিক হলের বিবরণ ছাপা হইয়াছিল। বিনোদ প্রেষ্টন পরিবারের সঙ্গে মিউজিক হলে যাইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া যে ভয়ানক ঠকিয়া গিয়াছে, সেইটা ভাল করিয়া প্রমাণ করিবার জন্যই বোধ হয় এলিজাবেথ সেগুলা হাতে করিয়া আনিয়াছিল।

ব্রেকফাষ্ট টেবিলে সাজাইয়া দিয়া এলিজাবেথ—খবরের কাগজগুলোর যে যে অংশে মিউজিক হলের বিবরণ ছিল, সেগুলো সে লাল নীল পেনশিল দিয়া দাগ দিয়া রাখিয়াছিল—সেগুলা বিনোদকে পড়িতে দিল। বিনোদ দেখিল, সকল সংবাদপত্রই শতমুখে ভারতবাসী বংশীবাদকের অজস্র প্রশংসা করিয়াছে; এবং উপসংহারে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে যে,—গানের মজলিস শেষ হইবার পর, আমাদের একজন প্রতিনিধি এই অশেষ গুণশালী সঙ্গীত-বিশারদের সঙ্গে 'ইনটারভিউ' করিবার জন্য গিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, মজলিস ভঙ্গ হইবার অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি হল ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেইজন্য আমরা পাঠক-পাঠিকাগণকে এই ভারতবাসীর কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না। তাঁহার

কোন ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই; সেইজন্য তাঁহার ছবিও ছাপিতে পারা গেল না। তবে আমাদের প্রতিনিধি অনেক কষ্টে বাদ্যকর সম্প্রদায়ের ম্যানেজার মিঃ টমাস পীয়ারসনের নিকট হইতে কেবল এইটুকু মাত্র সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন যে, এই যুবক—কারণ, ইঁহার বয়স বেশী নয়, এবং এই বয়সেই তিনি বংশীবাদনে এমন নিপুণতা লাভ করিয়াছেন—ভারতবর্ষের অন্তর্গত বাঙ্গলা প্রদেশের অধিবাসী এবং কলিকাতা হইতে, অল্প দিন হইল, লণ্ডনে পড়াশুনা করিতে আসিয়াছেন। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ;—সাধারণতঃ ভারতবাসীরা যেরূপ কালো হয়, ততটা কালো নহেন। ম্যানেজার মহাশয় তাঁহার গুণপনার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে তাঁহার দলে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু গান-বাজনা করা যুবকের পেশা নয়—তিনি একজন এ্যামেচার মাত্র; এবং পড়াশুনা করিবার জন্য লণ্ডনে আসিয়াছেন; সেইজন্য চাকুরী লইতে স্বীকার করেন নাই। আপাততঃ তিনি তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি মহাশয় আশা করেন যে, তিনি যখন যুবকের সম্বন্ধে এত খবর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা তেমন কঠিন হইবে না;—দুই তিন দিনের মধ্যেই তিনি যুবকের নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাঠক-পাঠিকাগণকে জানাইতে পারিবেন; এমন কি, তাঁহার ছবি পর্য্যন্ত পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিতে পারিবেন।

বিনোদ বিষম প্রমাদ গণিল। সে শুনিয়াছিল, সংবাদ সংগ্রহ করিতে এই অদ্ভুত-কর্ম্মা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা পারে না এমন কাজই নাই। এবং গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার পক্ষে ইহাদের দক্ষতা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টিকটিকি-গণের অপেক্ষা একটুও কম নয়। সুতরাং তাহারা যে দুই দিনেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, তাহা একটুও অসম্ভব নয়। সে মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, রিপোর্টারবা না হয় তাহাকে খুঁজিয়া বাহিরই করিল, এবং না হয় তাহারা তাহার কথা খবরের কাগজে ছাপিয়াই দিল; তাহাতে ক্ষতিই বা কি, এবং এত ভয়ই বা কি। কিন্তু তাহার মন এইরূপ যুক্তিবাদে সায় দিল না।

খবরের কাগজে মিউজিক হলের সংবাদ পড়িয়া এলিজাবেথ কহিল, "এরা বাদকের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছে তাহাতে, আমি যদি না জানিতাম যে আপনার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া আপনি কাল মিউজিক হলে যাইতে পারেন নি, তাহা হইলে মনে করিতাম, কালকের বাদক আর আপনি একই ব্যক্তি;—বর্ণনার সঙ্গে আপনার চেহারার খুব মিল হইতেছে।"

বিনোদের মনে হইতে লাগিল, সে সব কথা স্বীকার করিয়া ফেলে; কিন্তু সাহস হইল না।

সেই দিন ডিনার খাইতে যাইয়া বিনোদ দেখিল, বিপুল আয়োজন। সে একটু বিস্মিত হইয়া মিসেস প্রেষ্টনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ বুঝি মিস প্রেষ্টনের জন্মদিন?"

গৃহিণী বলিলেন, "না, তা নয়। আজ বিশেষ করিয়া তোমার জন্য বেথসী নিজে এই সব আয়োজন করিয়াছে।"

"কই, আজ আমার জন্মদিন কি না, তাহা আমার মনে পড়িতেছে না ত। আর তা' হইলেও আমি ত কোন কথা মিস প্রেষ্টনুকে বলি নাই।"

এ কথার জবাব গৃহিণী দিলেন না—দিল এলিজাবেথ। সে কৃত্রিম কোপের সহিত মৃদু হাস্য মিশাইয়া দাঁতে অধর চাপিয়া কহিল, "দুষ্টু ছেলে! ঠক, প্রবঞ্চক কোথাকার!" গৃহিণী, এবং চিরগম্ভীর কর্তাটিও এই হাসিতে যোগ দিলেন। বিনোদ কিছু বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "প্রহার করিবেন, করুন, কিন্তু আমার কথাটাও শুনুন"; এবং তাহার মল্লীনাথী ব্যাখ্যা করিল, "আমার দুর্নাম করিতে চান করুন; কিন্তু আমার অপরাধ কি, কেন আমি দুর্নামের ভাগী হইলাম, সে কথাটা আমাকে বুঝাইয়া দিন।"

এলিজাবেথ বলিল, "উঃ! কাল আপনার বড় অসুখ করেছিল, না?"

"তা' ত করে নি; সে কথা ত আমি কালই, তখনই আপনাকে বলেছিলাম। এমন কি আমার যে একটা এনগেজমেণ্ট ছিল,—সেখানে যেতে হবে, তাও ত আপনাকে বলেছিলাম, এবং সেখানে গিয়াছিলাম ত!"

"কোথায় এনগেজমেণ্ট ছিল আপনার?"

এ কথার জবাব দেওয়া যায় না। বিনোদ দেখিল, সে

ধরা পড়িয়া গিয়াছে—আর লুকোচুরি চলে না। সে চুপ করিয়া রহিল।

এলিজাবেথ পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিতে করিতে বলিল, "আপনার নামে একখানা চিঠি এসেছে; কিন্তু এ চিঠি আপনার নয়,—বোধ হয় কোন রকম ভুল হয়ে থাকবে। দেখুন দেখি, এ চিঠি আপনার কি?" বলিয়া সে খাম হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া বিনোদের হাতে দিল। বিনোদ সভয়ে দেখিল, কাল সে মিউজিক হলে যে অপূর্ব্ব গুণপনার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, তাহার জন্য অজস্র ধন্যবাদ দিয়া কনসার্ট পার্টির ম্যানেজার টমাস পীয়ারসন কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একখানি ১০০ পাউণ্ডের চেক পাঠাইয়া দিয়াছে। বিনোদ চেকখানি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিলে সে খুব 'ওব্লাইজ্‌ড' হইবে। ইত্যাদি।

বিনোদের হৃদয়ে তখন যে ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত। সে কাল কি এমন করিয়াছে, যাহাতে সে ১০০ পাউণ্ড অর্জ্জন করিতে পারে। সে সখ করিয়া একটু বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিল মাত্র। এই অপ্রত্যাশিত অর্থ, তাহার মনে হইল, তাহার ন্যায্য প্রাপ্য নহে। সে কখনই এ টাকা লইবে না। তাই সে দৃঢ়তার সহিত বলিল, "ভুল, ভুল! নিশ্চয়ই ভুল! এ চিঠি আমার নয়—এ চেকও আমার নয়। কাল আমি মিউজিক হলে গিয়াছিলাম বটে, বাঁশীও বাজাইয়াছিলাম বটে,—কিন্তু সে কেবল ঐ টমাস পীয়ার্সনের

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারাতেই। সে যে অত বিজ্ঞাপন দিয়া, লোক জড় করিয়া, আমাকে অমন অপ্রস্তুত করিবে, কিম্বা আমাকে টাকা দিবে,—এ রকম কোন কথাই তার সঙ্গে ছিল না। এ টাকা কখনই আমার প্রাপ্য নয়। তুমি এ চিঠি কোথা পেলে মিস এলিজাবেথ প্রেষ্টন?"

"আজ আপনি বেরিয়ে যাবার পর একজন পিয়ন এই খোলা চিঠি এনেছিল। আমি পিয়ন বইতে সই করে চিঠি নিলাম কি না; আর খোলা চিঠি ছিল বলে আমি পড়েছি। এতে কোন দোষ হয় নি ত মিঃ মোকার্জ্জি?"

"দোষ কিছুই হয় নি। কিন্তু চিঠি ফেরত দিলেই ভাল হত।"

"কেন?"

"এ টাকা ত আমার পাওনা নয়।"

এইবার কর্ত্তা কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "ও টাকা লইতে কোন দোষ নেই। আমাদের দেশে এ রকম টাকা নেওয়া কোন অন্যায় নয়। আর তোমার ত খুব প্রচুর টাকা নাই। এ টাকা সদুপায়ে উপার্জ্জিত, নির্দ্দোষ ও ন্যায্য। ইহাতে তোমার খরচপত্রের অনেক সুবিধা হবে। ইন্‌এ তোমাকে এখনও অনেক টাকা দিতে হবে ত! বেশী কষ্ট স্বীকার না করে, পড়াশুনার ক্ষতি না করে, মধ্যে মধ্যে এমনি সদুপায়ে তুমি যদি কিছু কিছু উপার্জ্জন করতে পার, তা' হ'লে তোমার কিছু ভাবনা থাকবে না।" মিসেস প্রেষ্টন ও মিস প্রেষ্টনও এই টাকা লওয়ার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিলেন।

কাজেই বাধ্য হইয়া বিনোদ টাকা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে আর কখনও কোন পেশাদার গান বাজনার দলে বাঁশী বাজাইবে না।

১৯

বিনোদের আন্তরিক চেষ্টায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এলিজাবেথ চলনসই গোছের বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিখিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ—সব কয়টিই সে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এপক্ষে বিনোদ বিশেষ সাহায্য করিতে পারিতেছে না। সে কলেজে যেটুকু সংস্কৃত পড়িয়াছিল, এলিজাবেথ তাহা অল্প দিনের মধ্যে অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। বিনোদ তাহাকে বাঙ্গলা ভাল রকম শিখাইতেছে; এবং সংস্কৃত শিখানোর সঙ্গে তাহাকে নিজেকেও শিখিতে হইতেছে।

এলিজাবেথ যে কয়খানি সংস্কৃত সাহিত্য পড়িয়াছে, তার মধ্যে কাদম্বরীখানি তাহার খুব ভাল লাগিয়াছে। এই কাদম্বরীর প্রধানা নায়িকা মহাশ্বেতার চরিত্র বিশেষ করিয়া তাহার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। একদিন সে বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মিঃ মোকার্জ্জি, মহাশ্বেতা কথাটার মানে কি ?"

বিনোদ বলিল, "অত্যন্ত সাদা। এই ধর, তুমি যদি কখনও আমাদের দেশে যাও, তবে আমাদের দেশের কালো,

পিঙ্গল, শ্যাম, কটা, পীত, গোলাপী রংয়ের লোকদের মাঝ-খানে তোমাকে খুব সাদা দেখাবে। এখানে তোমাদের দেশের সকল লোকই সাদা; কাজেই এখানে তোমার কোন বিশেষত্ব নেই। কিন্তু আমাদের দেশের লোকদের গায়ের রংয়ের সঙ্গে তুলনায়—কনট্রাষ্টের দরুণ—তোমার সাদা রং খুব ফুটে উঠ্‌বে। তখন তোমাকে যদি 'মহাশ্বেতা' নাম দেওয়া যায়, তবে—শ্বেত-দ্বীপের কন্যা তুমি—নামটা তোমাকে খুব মানাবে।"

এলিজাবেথ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আপনাদের দেশে যেতে আমার খুব ইচ্ছা করে। আর কিছুর জন্যে না হোক, অন্ততঃ ঐ নামটির খাতিরেও আমি আপনার দেশে যেতে পারি। আহা, মহাশ্বেতা বড় দুঃখিনী।"

বিনোদ বলিল, "আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে মহাশ্বেতার দুঃখ খুব বেশী নয়। তাঁর চেয়ে আরও অনেক বেশী দুঃখ পেয়ে-ছেন এমন নায়িকার অভাব নেই। তার সাক্ষী সীতা। সীতার দুঃখের তুলনায় মহাশ্বেতার দুঃখ তত বেশী নয়।"

"কিন্তু দুইজনের দুঃখ দুই রকমের—একেবারে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সীতার দুঃখ অনেকটা নিজের ইচ্ছা কৃত; আর মহাশ্বেতার বড় দুর্ভাগ্য।"

"হাঁ, কথাটা কতকটা ঠিক বটে।"

সাহিত্য চর্চ্চা হইতে হইতে অন্য কথা আসিয়া পড়িল। এলিজাবেথ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আচ্ছা, মিঃ মোকার্জ্জি, আপনার দেশের জন্যে আপনার মন কেমন করে না?"

"করে বই কি।"

একসঙ্গে পড়াশুনার খাতিরে গুরু-শিষ্যের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। কলিকাতা হইতে বিনোদকে চিঠি লিখিবার মধ্যে তাহার পিসিমা; আর দুই একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু। পিসিমা বাঙ্গলাতেই চিঠি লেখেন; আর বন্ধু বান্ধবেরা লেখে ইংরেজিতে। সে সকল চিঠিতে বিশেষ কোন কিছু গোপনীয় ব্যাপার না থাকাতে, খোলা চিঠি ঘরের যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। ঘর পরিষ্কার করিবার সময়ে এলিজাবেথ কোন কোন চিঠি পড়িয়া ফেলিত। বিনোদের তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদের ইংরেজি চিঠি পড়িতে এলিজাবেথের কিছুই বাধিত না। কিন্তু পিসিমার বাঙ্গলা চিঠি সে প্রথম প্রথম কিছুই বুঝিতে পারিত না। ক্রমে সে যখন একটু একটু বাঙ্গলা শিখিল, তখন সে অভ্যাস করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, বিনোদের সঙ্গে বাঙ্গলাতেই আলাপ করিত, এবং পিসিমার চিঠিগুলি অতি আগ্রহের সহিত পড়িবার চেষ্টা করিত। এইরূপে ইদানীং পিসিমা যত চিঠি লিখিতেন, সে সমস্তই এলিজাবেথ পড়িয়া ফেলিয়াছিল। এবং বুঝিয়াছিল, বিনোদের আপনার লোকের মধ্যে মাত্র এই একজন। আর সকলে বন্ধু মাত্র—আত্মীয় কেহই নহেন।

একদিন এলিজাবেথ বিনোদকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ মোকার্জ্জি, ভারতবর্ষে আপনার কে কে আছেন?"

"আমার পিতা আছেন; আর এক ভগিনী আছেন; আর

'আণ্ট'।" আণ্টের ব্যাখ্যা করিল—পিতার ভগিনী,—পিসিমা।

"আর কেউ নেই ?"

"না।"

বিনোদ কথাটা বলিল এক ভাবে ; এলিজাবেথ অন্য ভাবে বুঝিল।

বিনোদের স্ত্রী আছে। কিন্তু বিনোদ ত তাহাকে স্বীকার করে না ; তাই সে তাহাকে আত্মীয়ের মধ্যে গণনা করিল না। এলিজাবেথ বুঝিল, বিনোদ অবিবাহিত। নচেৎ বিবাহিত হইলে তাহা স্বীকার করিত ; বলিত, তার আর একজন আত্মীয়—স্ত্রী আছে। আর বিনোদ বিবাহিত হইলে, তাহার স্ত্রী কি আজ পর্য্যন্ত একখানাও চিঠি লিখিত না ! মিঃ মোকার্জ্জি যখন স্পষ্টই বলিতেছে, তাহার আর কেউ নেই, তখন নিশ্চয়ই তাহার বিবাহ হয় নাই। এইরূপ ভাবিয়া এলিজাবেথ বিনোদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করিতে লাগিল যে, সে অ-বিবাহিত—কুমার। সে যদি স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিত যে, মিঃ মোকার্জ্জি, আপনার কি বিবাহ হইয়াছে ? তাহা হইলে বিনোদ হয় ত তাহার বিবাহের কথা অস্বীকার করিতে পারিত না,—বলিতে বাধ্য হইত যে, সে বিবাহিত ; এবং হয় ত, তাহার স্ত্রী তাহাকে কেন পত্রাদি লেখে না, তাহারও যেমন তেমন একটা কৈফিয়ৎও দিতে পারিত। তাহা হইলে অবস্থাটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু একটী যুবতী—তা' হউক না কেন সে ইংরেজের মেয়ে—একটী যুবককে—এবং সে যুবকও

একটী বাঙ্গালী যুবক হউক, তাহাতে কি আসে যায় ?—কখনই স্পষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিতে পারে না যে, 'ওগো, তোমার কি বিবাহ হইয়াছে ?' কাজেই, কথাটা খোলসা হইল না বলিয়া, এলিজাবেথের মনে একটা ভুল ধারণা জন্মিয়া গেল।

সে যে ভাবে বিনোদের পারিবারিক কথাবার্ত্তা পাড়িয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, এই বিষয়টি জানাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিনোদ যে উত্তর দিল, তাহাতে এলিজাবেথের মনে যে ধারণা জন্মিল, সেজন্য তাহাকে দোষী করা যায় না। তাহাদের দেশে বিনোদের বয়সী অনেকেই ত অবিবাহিত থাকে। বরং এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ করাই সে দেশের যুবকদের পক্ষে কতকটা অস্বাভাবিক বটে। সুতরাং কথাটা স্পষ্ট করিয়া খোলসা করিয়া না লইলেও, বিনোদকে কুমার মনে করা এলিজাবেথের পক্ষে বিশেষ দোষের হইতে পারে না। বিনোদকেও আমরা আপাততঃ দোষী করিতে পারিতেছি না। এলিজাবেথের প্রশ্নের গূঢ় মর্ম্ম যদি কিছু থাকে, তবে তাহা সে আদৌ ধারণাই করিতে পারে নাই। প্রশ্নটা খুব সোজাসুজি মনে করিয়াই সে তাহার নিজের ধারণা মত জবাব দিয়াছিল যে, তাহার আর কেহ নাই। তবে তাহার এইরূপ উক্তির ফলে পরে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেজন্য সে কতখানি দায়ী, তাহা আমরা যথাসময়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবার যথেষ্ট অবসর পাইব। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, এখনই তাহার জন্য কাহাকেও দায়ী করিবার এখানে বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

প্রেষ্টন পরিবারে আজ অতিথি সমাগম হইয়াছে। জর্জ্জ ম্যাকনীল ভারতবর্ষে সরকারী আপিসে উচ্চ পদে কর্ম্ম করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রিচার্ড ম্যাকনীল পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভারতবর্ষে গিয়াছিল,—এক্ষণে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছে।

ম্যাকনীলেরা প্রেষ্টনদের প্রতিবাসী। রিচার্ড এলিজাবেথের আশৈশব সঙ্গী এবং খেলার সাথী। উভয়ে বড় ভাব। মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু না বলিলেও, মিঃ প্রেষ্টন, মিসেস প্রেষ্টন, এবং প্রতিবাসীরা সকলেই জানিতেন যে, রিচার্ডের সহিত এলিজাবেথের বিবাহ হইবে। এ সংবাদটি রিচার্ড ও এলিজাবেথেরও অজ্ঞাত ছিল না। রিচার্ড বার্ম্মিংহামে একটা ইস্পাতের কারখানায় শিক্ষানবীশী করিত। তাহার শিক্ষানবীশীর কাল শেষ হইলে,—সে উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ হইলেই, এলিজাবেথ তাহার ঘরণী গৃহিণী হইয়া নিজের সংসার পাতাইবে, ইহাই ছিল সকলের ধারণা। এই সূত্রে প্রেষ্টন-পরিবারের সহিত ম্যাকনীল-পরিবারের এবং বিশেষ করিয়া রিচার্ডের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। মিঃ ম্যাকনীল চাকুরী সূত্রে সপরিবারে ভারতবর্ষেই থাকিতেন। তাই দু'চার দিনের জন্য ছুটি পাইলে রিচার্ড লণ্ডনে আসিয়া প্রেষ্টন পরিবারের সহিত কাটাইয়া যাইত। এবার কিছু বেশী দিনের ছুটী পাওয়ায় সে ভারতবর্ষে পিতা-মাতার চরণ-বন্দনা করিতে গিয়াছিল। ফিরিবার মুখে প্রেষ্টন-

পরিবারের সহিত, এবং বিশেষতঃ তাহার ভাবী পত্নীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। দু' একদিন থাকিয়াই বার্ম্মিংহামে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু, এবার আসিয়া সে দেখিল, প্রেষ্টন পরিবারে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—একজন নূতন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। সে লোকটী আমাদের বিনোদ, ওরফে মিঃ মোকার্জ্জি। রিচার্ড যখন শেষবার এখানে আসিয়াছিল—সে আজ প্রায় এক বৎসরের কথা—তখন বিনোদ লণ্ডনে যায় নাই; কাজেই, রিচার্ডও তাহাকে দেখে নাই।

অবশ্য, ভাবী জামাতাকে মিঃ ও মিসেস প্রেষ্টন আদর যত্নের কোনই ত্রুটি করিলেন না—বিবাহ যে নাও ঘটিতে পারে, এমন সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও তাঁহাদের মনের কোণেও স্থান পায় নাই। কিন্তু, বিধাতা পুরুষের স্বভাব যাইবে কোথায়! বিশেষতঃ, তাঁহার যখন মরণ নাই! তিনি যথারীতি অলক্ষ্যে বসিয়া যেমন মানুষের কল্পনায় প্রাসাদ গড়া দেখিয়া হাসিয়া থাকেন,—এ ক্ষেত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

বিনোদ তাঁহাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসিবার পর, এক বাড়ীতে বাস হেতু বিনোদের সহিত এলিজাবেথের কর্ম্মসূত্রে ঘনিষ্ঠতা হওয়ায়, তাহার যে কোন ভাবান্তর ঘটিয়াছে—ইহা এলিজাবেথের পিতা মাতা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; অথবা করেন নাই। কিন্তু রিচার্ডের চোখে তাহা ধরা পড়িতে মুহূর্ত্ত-মাত্র বিলম্ব হইল না।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ববার এ বাটীতে আসিয়া রিচার্ড এলিজাবেথকে যেমন নিজস্ব ভাবে কাছে পাইত, এবার আর তেমন করিয়া পাইল না। যে কয় দিন সে এখানে রহিল, সে কয় দিনই এলিজাবেথ, যেন ইচ্ছা করিয়াই, রিচার্ডের নিকট হইতে দূরে দূরে রহিল; একটু চেষ্টা করিয়াই যেন রিচার্ডকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। আগেকার মত তেমন প্রাণ খুলিয়া হাসি,—তেমন আবশ্যক অনাবশ্যক কতই না কথা,—সেই হ্রদের ধারে, পাহাড়ের কোলে নির্জ্জনে হাত ধরাধরি করিয়া পাদচারণা—এ সকল এবার কিছুই হইল না; এমন কি, রিচার্ডের বোধ হইতে লাগিল, নির্জ্জনে তাহার সহিত দেখা হইলেই এলিজাবেথের মুখখানি আঁধার হইয়া আসে; আবার বিনোদের দেখা পাইলে কিংবা তাহার সহিত কথা কহিবার সময় এলিজাবেথের মুখখানি অন্তরের আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, গাল দুটীতে লাল আভা দেখা দেয়—অলক্ষ্যে থাকিয়া রিচার্ড ইহাও লক্ষ্য করিল। সে দেখিল বিষম প্রমাদ। বিনোদের উপর তাহার মনটা স্বভাবতঃই কেমন যেন তিক্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কোন উপায় নাই। প্রেষ্টন-দম্পতির সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে রিচার্ড বিনোদের পরিচয় লইতে গিয়া দেখিল, এই দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার বিনোদের উপর অখণ্ড শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তাঁহারা উভয়েই বিনোদের প্রশংসায় সহস্র কণ্ঠ। "বড় ভাল ছেলে। কেবল পড়াশুনা লইয়াই থাকে। স্বভাবটি বড় মিষ্ট। খুব শান্ত, সংযত ও ভদ্র।" এইরূপ কত প্রশংসাই যে তাঁহারা

বিনোদের করিলেন, তাহার পরিমাণ করা যায় না। সন্তানের কোন কৃতিত্বের কথা কহিবার সময়ে পিতা-মাতার বুক যে ভাবে গৌরবে ফুলিয়া উঠে, সেইরূপ গৌরব করিয়া তাঁহারা রিচার্ডকে জানাইয়া দিলেন যে, বিনোদের শিক্ষাদানের গুণে এই কয় মাসেই বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় এলিজাবেথের চলনসই গোছের জ্ঞান জন্মিয়াছে। তার পর যখন বিনোদের বংশীবাদন-নিপুণতার কথা উঠিল, তখন তাঁহারা সগৌরবে মিউজিক হলের কাহিনী বিবৃত করিলেন ; এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মাত্র পরিশ্রমের ফলে একশত পাউণ্ড পারিশ্রমিক প্রাপ্তির কথাও রিচার্ডকে জানাইয়া দিতে ভুলিলেন না—যেন বিনোদ তাঁহাদেরই একটী পুত্র-সন্তান। এই সংবাদে রিচার্ডের মুখ আরও অন্ধকার হইয়া উঠিল।

প্রেষ্টনদের বাড়ীখানি রিচার্ডের পক্ষে কণ্টক-শয্যার মত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। বার্ম্মিংহামে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সে একবার—একটীবার মাত্র—এলিজাবেথকে কেবল মিনিট দুইয়ের জন্য নির্জ্জনে পাইবার শত চেষ্টা করিল। কিন্তু বিধাতা তাহার প্রতি একান্তই বাম—এই প্রার্থিত শুভ অবসরটি কিছুতেই তাহার হইল না। অবশেষে আর বিলম্ব করিলে কার্য্যহানি ঘটিবার আশঙ্কায় সে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে দুঃখের জগদ্দল পাথর বুকে বাঁধিয়া বার্ম্মিংহামে চলিয়া গেল।

২১

বিনোদ পড়াশুনায় বরাবরই ভাল। সে কলিকাতায় যেমন প্রশংসার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল,

ব্যারিষ্টারি পরীক্ষাতেও তাহার ভাগ্যে সেইরূপ প্রশংসাই লাভ হইল। এইবার গৃহে যাত্রা করিতে হইবে।

সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আর কখনও সে কোন পেশাদার কনসার্টের দলে বাজাইবে না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা সে রাখিতে পারে নাই। বোধ হয়, তাহা তেমন আন্তরিক ছিল না, কাজেই তাহার জোরও বিশেষ ছিল না। টাকার অভাবেই তাহাকে মধ্যে মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। যে দেশে পয়সা না ফেলিলে একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত মিলিবার উপায় নাই, সে দেশে সে এরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় কেমন করিয়া চালাইবে? প্রতি কথায় প্রতি পদে তাহাকে অর্থের অভাব অনুভব করিতে হইত। অতএব সে যখন অত সহজে টাকার আস্বাদ পাইয়াছে, তখন অভাবে পড়িলেই সে বাজাইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিত। খবরের কাগজওয়ালাদের রিপোর্টাররা বৃথা আস্ফালন করে নাই—অল্প সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র-সমাজের ভিতর হইতে তাহারা অতি সহজেই বিনোদকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিয়াছিল। কয়েকখানি খবরের কাগজে তাহার ছবিও বাহির হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পরিচয় যেটুকু আগেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার অধিক সে আর কিছু প্রকাশিত হইতে দেয় নাই। তবুও সে খুব বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই নিমন্ত্রণ তাহার নামে প্রায়ই আসিত। কেবল পেশাদার কনসার্ট নয়—ভদ্রলোকদের সামাজিক মজলিসে গান বাজনার ব্যবস্থা থাকিলে, সময়ে সময়ে উপরোধ এড়াইতে

না পারিয়া তাহাকে বাজাইতে হইত। বাহির হইতে উপরোধ ত আসিতই; অনেক সময়ে প্রেষ্টন-দম্পতি, এমন কি, এলিজাবেথ পর্য্যন্ত তাহাকে উপরোধ করিয়া এইরূপ সামাজিক মজলিসে লইয়া যাইত। এরূপ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

রিচার্ড আরও কয়েকবার প্রেষ্টন-গৃহে আসিয়াছে। রিচার্ড আসিলেই প্রেষ্টন-দম্পতি একটু আধটু আমোদের ব্যবস্থা করিতেন। এখানে ত বিনোদকে বাজাইতে হইতই। ক্রমে রিচার্ডের সঙ্গে বিনোদের আলাপ পরিচয়ও হইল; কিন্তু তাহাদের কেহই কাহাকেও প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিল না। রিচার্ড প্রথম দিনেই যাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, বিনোদও ক্রমে এলিজাবেথের সেইরূপ ভাব-বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিতে শিখিল। ইহাতে তাহার হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। স্ত্রীর হিসাবে এলিজাবেথ তাহার খুব মনের মতন। কিন্তু সে যে বিবাহিত! এইরূপে তাহার মনে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এলিজাবেথের হৃদয় জয় করিতে পারায় সে যেমন একদিকে সুখী হইল, তেমনি তাহাকে বিবাহ করিবার যো না থাকায় সে মহা দুঃখিত হইল। তাহার বিবাহ উপলক্ষে পিতার উপর প্রথমে তাহার যে রাগ হইয়াছিল, এখন তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি?

দীর্ঘ প্রবাস-কাল ব্যাপিয়া তাহার মনে সু ও কু-এর দ্বন্দ্ব চলিল। অবশেষে কু-ই জয়লাভ করিল। সে মনকে জোর

করিয়া, অনেক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বুঝাইল যে, সুলোচনাকে সে যখন গ্রহণ করে নাই, স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করে নাই, তখন এলিজাবেথকে যদি সে বিবাহ করে, তাহা হইলে কোন দোষ হইতে পারে না।

এদিকে এলিজাবেথ নিজেও বিশেষ বিপন্না হইয়া উঠিয়াছিল। বিনোদ তাহাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসিবার পর, প্রথম প্রথম তাহার অপটুত্ব দেখিয়া, এলিজাবেথ তাহার প্রতি একটু সহানুভূতি ও স্নেহপরবশ হইয়া, তাহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। ক্রমে সেই সহানুভূতি ও স্নেহ রূপান্তরিত ও ভাবান্তরিত হইতে লাগিল। সে ক্রমশঃ বিনোদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে এই ভাবটা তাহার কাছে খুব স্পষ্ট হইয়া আসিল তখন, যখন রিচার্ড ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। এতদিন যেটুকু ইতস্ততঃ ভাব ছিল, এখন আর সেটুকুও রহিল না। তাহার মনের গতি তাহার কাছে অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার এই ভাবান্তর যখন বিনোদের কাছে ধরা পড়িল, তখন বিনোদকেও চিন্তিত করিয়া তুলিল। তার পর দুইজনেরই মনে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ভাব ক্রম-পরিণতি লাভ করিতে করিতে, একদিন এক শুভ কি অশুভ মুহূর্ত্তে উভয়েই উভয়ের কাছে স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ইংরেজি প্রণয়-পরিণয়ের শাস্ত্রে, প্রেমের সাহিত্যে ইহারই নাম "The Declaration"! তখন বিনোদের পাঠ প্রায় সাঙ্গ হইয়া আসিয়াছে—পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী।

ইহার পর হইতে উভয়ের মধ্যে পরামর্শ চলিতে লাগিল। ক্রমে বিনোদের পরীক্ষা শেষ হইল, সে পাশও হইল। ইতো-মধ্যে পরামর্শও শেষ হইল ; স্থির হইল যে, বিনোদের স্বদেশ-যাত্রার দুই একদিন পূর্ব্বে উভয়ে গোপনে রেজিষ্ট্রি আপিসে গিয়া বিবাহিত হইবে। বিনোদ দুইজনের জন্য জাহাজে বার্থ রিজার্ভ করিয়া রাখিবে ; এবং যথাসময়ে উভয়ে ভারতবর্ষে চলিয়া যাইবে।

কল্পনা ও পরামর্শ যেমন হইয়াছিল, ঘটিলও ঠিক তাই। এলিজাবেথ তাহার মাতামহের মৃত্যুর পর তাঁহার উইল অনুসারে কিছু নগদ টাকা পাইয়াছিল। সে টাকা তাহার নামে একটা ব্যাঙ্কে জমা ছিল। এলিজাবেথ সেই টাকা ব্যাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া আনিয়া নিজের কাছে রাখিল। বিনোদও দুই একটা মজলিসে বাজাইয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিল। তার পর একদিন রেজিষ্ট্রি আপিসে গিয়া দুইজনে বিবাহ করিয়া আসিল। অনন্তর বিনোদ জাহাজের আপিসে গিয়া মিঃ ও মিসেস মোকার্জ্জি নামে একটা ক্যাবিন ভাড়া করিয়া আসিল। অবশেষে জাহাজ ছাড়িবার দিন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া জাহাজে আসিয়া আবার অনন্ত সমুদ্রে পাড়ি দিল।

২২

বিধুভূষণ ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিয়া,নগরোপকণ্ঠে এক-খানি বাগানবাড়ী ভাড়া করিয়া, প্রায় স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত ভাবে বাস করিতেছিলেন। এখানে তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী প্রভা-

বতী (বিবাহের মাস কয় পরে তাহার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, এবং এই তিন বৎসরে তাহার আরও দুইটী সন্তান জন্মিয়াছিল), সুশীলা, এবং তিনটী পুত্র কন্যা—ইহাদের লইয়া তাঁহার সংসার। ছুটী ফুরাইলে তিনি আর কর্ম্মে যোগ দেন নাই—পেন্‌শন লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী কাশীতেই ছিলেন—ভ্রাতার সংসারে আর পদার্পণ করেন নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া বিনোদ প্রথমে সস্ত্রীক এক সাহেবী হোটেলে উঠিল। পরদিন একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল ; এবং যথারীতি হাইকোর্টে 'এনরোল্‌ড' হইল। কিন্তু তাহার প্রবীণ, বহুদর্শী হাকিম পিতা যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে ঘটিলও তাহাই। হাই-কোর্টে গিয়া প্র্যাকটিস করা তাহার পোষাইল না। বিলাত হইতে যাত্রাকালে তাহাদের পতি-পত্নীর কাছে যাহা টাকাকড়ি ছিল, জাহাজ ভাড়া প্রভৃতিতে তাহার অধিকাংশ খরচ হইয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট টাকা বাড়ী ভাড়া এবং সংসার খরচেই ফুরাইয়া আসিল। কলিকাতা লণ্ডন নয় যে এখানে মিউজিক হলে নিত্য গানের মজলিস বসিবে, এবং লোক তাহার বাঁশী শুনিয়া তাহাকে টাকা ঢালিয়া দিবে। টাকা যখন ফুরাইয়া আসিল এবং ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনেরও যখন কোন সুবিধাই হইল না, তখন মধ্যে মধ্যে দুই একবার লণ্ডনে ফিরিয়া যাইবার কথা তাহার মনে হইত। কিন্তু রিক্ত হস্তে তাহাও ত চলে না। এবং এক-দিন ইহার একটু আভাষ দিতেই মহাশ্বেতা (বাঙ্গলার ভূমিতে

পদার্পণ করিয়াই এলিজাবেথ এই নামটি গ্রহণ করিয়াছিল) এমন ঘোর আপত্তি করিয়া উঠিল যে, দ্বিতীয়বার আর সে কথা উত্থাপন করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। তখন বিনোদ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তাহার পিসিমাকে চিঠি লিখিল।

তাঁহার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র মেম বিবাহ করিয়া আসিয়াছে শুনিয়াই পিসিমা ভয়ঙ্কর চটিয়া গেলেন—সুলোচনাকে তিনি যথার্থই ভালবাসিয়াছিলেন। বিনোদ যে আর কখনও সুলোচনাকে লইয়া ঘর করিবে, এ আশা আর রহিল না। তাঁহার বিরক্তির আর একটা কারণ, তিনিই উদ্যোগী হইয়া, ভ্রাতার মতের বিরুদ্ধে, বিনোদকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন; এবং তাহাকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন। এজন্য ভ্রাতার নিকটে তাঁহার আর মুখ দেখাইবার যো ছিল না।

দুই তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল, অথচ পিসিমার নিকট হইতে চিঠির জবাব আসিল না দেখিয়া, বিনোদ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আর একখানা চিঠি লিখিল। এবার পিসিমা সংক্ষেপে জবাব দিলেন, "তুমি যখন মেম বিবাহ করিয়া আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচাইয়াছ, তখন আমি আর কি করিতে পারি।" বিনোদ অকূল পাথারে পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল।

তখন স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ আরম্ভ হইল। বিনোদ প্রস্তাব করিল, "চল, আমরা দুজনেই পিসিমার কাছে যাই।"

মহাশ্বেতা এখন বেশ বাঙ্গলা কথা বলিতে ও লিখিতে

পারিত। এখন তাহাদের স্বামী-স্ত্রীতে বাঙ্গলা ভাষাতেই কথা-বার্ত্তা চলিত। বিনোদ কখনও ইংরেজীতে কথা কহিতে গেলে, মহাশ্বেতা তাহাকে অনুযোগ করিয়া, বাধা দিয়া, দমাইয়া দিত। সে কহিল, "তা, কেমন কোরে হবে? তুমি আমাকে বিবাহ করেছ বলেই যখন তিনি চটে গেছেন, তখন আমি গেলে তিনি আরও চটে যাবেন। তুমি একাই যাও।"

বিনোদ কহিল, "তুমি আমার পিসিমাকে জান না। তাঁকে ভোলাতে আমাদের কিচ্ছু কষ্ট পেতে হবে না। তুমি বেশ বাঙ্গলা কথা কইতে শিখেছ; এখন তুমি যদি আমাদের দেশের মেয়েদের মতন করে কাপড় পরতে শেখ, আমাদের দেশের মেয়েলী আচার ব্যবহার দু'চারটে শিখে নিতে পার, তা'হলেই পিসিমা একেবারে জল হয়ে যাবেন।"

"পিসিমাকে ভোলাবার জন্যে যত না হোক, তোমার যাতে সুবিধে হয়, তা আমি করতে রাজী আছি।"

তখন দিন কতক ধরিয়া বিনোদ মহাশ্বেতাকে তালিম দিতে লাগিল। কিন্তু বিনোদ' এ বিষয়ে একেবারে মহা ওস্তাদ—তাহার প্রায় সকল কাজেই ভুল হইয়া যাইতে লাগিল। তখন সে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল। কিন্তু মহাশ্বেতা হটিবার পাত্রী নয়। সে অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। একদিন সে তাহার স্বামীর কাছে প্রস্তাব করিল, "এ পাড়ায় তোমাদের সমাজের গৃহস্থ ঘর ত একটাও নেই। এখানে থেকে আমাদের লাভ কি? চল না, যেখানে তোমাদের সমাজের

ভদ্র গৃহস্থরা থাকে, সেই রকম কোন যায়গায় গিয়া থাকি। সেখানে তাদের সঙ্গে আলাপ, পরিচয়, ঘনিষ্টতা, মেশামিশি হলে আমি দু' দিনে তোমাদের দেশের মেয়েদের আচার ব্যবহার, সাজ পোষাক করা—এ সমস্ত শিখে নিতে পারব।"

বিনোদ বলিল, "হিন্দু পল্লীতে গিয়ে থাকতে হলে, মুসলমান বাবুরচি, খানসামা সব বদল করতে হবে ; হিন্দু ধরণে রাঁধুনী বামুন, ঝি, চাকর রাখতে হবে। খাওয়া দাওয়ার ধরণও বদলাতে হবে। রুটী (পাঁউরুটী), মাংস ত সেখানে চলবে না। —ডাল ভাত চচ্চড়ি কি তুমি খেতে পারবে ?"

মহাশ্বেতা কহিল, "আমার জন্যে তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই—সে আমি সমস্তই পারব। তোমাদের আচার ব্যবহার, ধরণ ধারণ, খাওয়া দাওয়া—এ সমস্ত শেখবার আমার নিজেরই খুব ইচ্ছে হয়েছে। তুমি সেই ব্যবস্থাই কর।"

"তা যেন করলুম। কিন্তু আর একটা অসুবিধা আছে।"

"কি ?"

"পাড়ার গৃহস্থদের মেয়েরা তোমার সঙ্গে মিশতে হয় ত সাহস পাবে না।"

"কেন ? আমি কি বাঘ, ভালুক, যে তাদের খেয়ে ফেলব ?"

"কিন্তু তুমি ইংরেজের মেয়ে যে !"

"তা হলামই বা। আমি তোমার সঙ্গে যেমন বাঙ্গলায় কথা কই, তাদের সঙ্গেও তেমনি কইব ; তাদের মতন সাজ পোষাক পরব ; তবুও কি তারা আমার সঙ্গে আলাপ করতে ভয় পাবে ?"

"কিন্তু তোমার গায়ের রং, তোমার চোখ, তোমার চুল —এ সব ঢাকতে পারবে না!"

"তা' ঢাকবার দরকার কি! তাদের কাছে আমার প্রকৃত পরিচয় ত আমি লুকুচ্চি না, যে, ছদ্মবেশ ধরে তাদের ঠকাতে যাব। আমি আমার প্রকৃত পরিচয় লুকুতে চাই না—আমি কেবল তাদের মতন হয়ে তাদের সঙ্গে থাকতে চাই। এতে তাদের কি আপত্তি হতে পারে, আর ভয়েরই বা কি কারণ ঘটতে পারে?"

"তা' কিছু বলা যায় না। আচ্ছা, তবে চেষ্টা করে দেখা যাক। হয় ত আপত্তি, ভয় নাও হতে পারে।"

এই পরামর্শ স্থির করিয়া বিনোদ হিন্দু পল্লীতে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া আসিল; হিন্দু ধরণের দুই চারিটা আসবাব যোগাড় করিল; একজন রাঁধুনী বামুন, একজন ঝি ও একটা চাকরও নিযুক্ত করিল। বিনোদ হ্যাট, কোট, প্যাণ্টালুন ছাড়িল; ধুতি পরিল। মহাশ্বেতা গাউন ত্যাগ করিয়া, সেমিজ শাড়ী ধরিল। তার পর দুইজনে সেই বাড়ীতে উঠিয়া গেল।

এখানে আসিয়া মহাশ্বেতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতিবাসী গৃহস্থদের মেয়েদের বস্ত্র পরিধানের ধরণ, এবং অন্যান্য ভাবভঙ্গী ও আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতে লাগিল; এবং একা একা যতদূর পারা যায়, সে সমস্ত অভ্যাসও করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল, ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার—একা একা অভ্যাস করা

অসম্ভব; অপরের সাহায্য ও উপদেশ ভিন্ন হওয়া কঠিন এবং তাহাও সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু তথাপি সে একেবারে হাল ছাড়িল না। দুই এক দিনের মধ্যে সে পাশের বাড়ীর দুই একটী মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিল। যেমন অধ্যবসায়ের সহিত সে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিখিয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়াই সে বাঙ্গালী মেয়ে সাজা অভ্যাস করিতে লাগিল। তাহার এই অধ্যবসায় নিষ্ফল হইল না—কিছু দিনের মধ্যেই সে মোটামুটি রকমে তৈয়ার হইয়া উঠিল।

ইতোমধ্যে সে বামুন ঠাকরুণের সহিত ভাব করিয়া বাঙ্গালী ধরণের রন্ধনও কতক কতক শিখিয়া ফেলিল। ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, খিচুড়ী, ঝোল, ভাজা প্রভৃতি কিরূপে রন্ধন করিতে হয়, তাহাও সে মোটামুটি রকমে আয়ত্ত করিল। এই সঙ্গে নানাবিধ তরকারী এবং রন্ধনের মশলার নামও তাহাকে মুখস্থ করিতে হইত। এ বিষয়ে প্রায়ই ভুল হইত বলিয়া, সে বিনোদের নিকট হইতে তরকারী ও মশলাগুলির ইংরেজী ও বাঙ্গলা নাম লিখিয়া লইয়া, স্কুলের পড়ার মত তাহা রীতিমত মুখস্থ করিত; এবং মধ্যে মধ্যে বিনোদের কাছে যাচিয়া গায়ে পড়িয়া পরীক্ষাও দিত। কেবল অর্থাভাবের দরুণই যা' কিছু অসুবিধা বিনোদকে সহ্য করিতে হইতেছিল। তা'ছাড়া, সে এলিজাবেথকে বিবাহ করিয়া, অন্য সকল রকমে সুখীই হইয়াছিল। এলিজাবেথ যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালীরই মেয়েদের মত সর্ব্ব রকমে তাহার মনের মতন হইবার চেষ্টা করিতেছে,

তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহাতে তাহার মনে আহ্লাদের সীমা ছিল না।

কিন্তু, হায়, এই সঙ্গে যদি তাহার অর্থের স্বচ্ছলতা থাকিত! দেখা যাক, পিসিমা কি করেন।

২৩

পিসিমা মুখে যতই রাগ প্রকাশ করুন,—ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্কন্যা ভিন্ন তাঁহার আপনার লোক আর কেহ ছিল না। বিনোদকে তিনি যথার্থই স্নেহ করিতেন। সে যখন পত্রের উপর পত্র লিখিয়া তাঁহাকে তাহার দুঃখ দুরবস্থার কথা জানাইতে লাগিল, তখন তিনি তাহাকে স্পষ্ট বাক্যে কোনরূপ আশ্বাস না দিলেও, তাঁহার মনটা অনেকটা নরম হইয়া আসিল।

এদিকে বিনোদ তাঁহার কাছে কোন ভরসা না পাইয়া ক্রমে অধীর হইয়া উঠিতেছিল। তহবিল ত প্রায় শূন্য! আর ত দিন চলে না। পিসিমার কাছে গিয়া না পড়িলে তাঁহার ক্রোধেরও শান্তি হইবে না। সে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিল। এদিকে অক্লান্ত চেষ্টায় মহাশ্বেতাও একরকম তৈয়ার হইয়া উঠিয়াছিল। কাপড় পরিতে তাহার আর ভুল হয় না; এবং সে যখন বাঙ্গালীর মেয়ের মত বেশ ভূষা করে, তখন তাহাকে মেয়েদের চাইতেও সুন্দর দেখায়। একদিন পাড়ার এক বাড়ীতে এক ভদ্রলোকের কন্যার বিবাহ ছিল। মহাশ্বেতা চেষ্টা করিয়া এই বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে ভাব

করিয়া ফেলিয়াছিল। বিবাহ উৎসবের কথা শুনিয়া, সে ঐ বাড়ীর মেয়েদের কাছে প্রস্তাব করিল, "তোমাদের বিবাহ উৎসব কি রকম, আমি দেখিব।" বন্ধুর এ অনুরোধ তাহারা অগ্রাহ্য করিতে পারিল না ;—বাটীর পুরুষ অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের মত লইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল। বিবাহ বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইবে শুনিয়া, বিনোদ মহাশ্বেতাকে উপদেশ দিল যে, সে যেন একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে। কারণ, বিবাহ-বাড়ীতে অনেক আত্মীয়া ও কুটুম্বিনীর সমাবেশ হইবে—তাহাদের সঙ্গে যখন তাহার আলাপ পরিচয় হয় নাই —তখন তাহার ঘনিষ্ঠতা সকলে পছন্দ না করিতে পারে। মহাশ্বেতা এ উপদেশটি মনে রাখিল।

উৎসব শেষে সে নিরাপদে নিমন্ত্রণ সারিয়া আসিয়া মহা আনন্দে বিনোদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপে প্রবৃত্ত হইল। এমন একটা সামাজিক উৎসবের নিমন্ত্রণে মহাশ্বেতা ঠিক উৎরাইয়া গিয়াছে দেখিয়া, বিনোদও খুব খুসী হইয়া উঠিয়াছিল। মহাশ্বেতা খুব মনোযোগের সহিত বিবাহের প্রত্যেক অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়াছিল। সে দেখিল, বর কন্যার মস্তকে সিঁদূর পরাইয়া দিল। আরও অনেক মেয়ের সিঁথিতে সে সিঁদূর দেখিয়াছিল। সে বিনোদকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বিনোদ বলিল, ইহা সধবার লক্ষণ। মহাশ্বেতাও আবদার ধরিল, "তবে আমাকেও সিঁদূর পরাইয়া দাও।" পরদিনই বিনোদ এক বাণ্ডিল সিঁদূর আনিয়া তাহার একটুখানি লইয়া

মহাশ্বেতার সীমন্তে পরাইয়া দিল। মহাশ্বেতা আরসিতে তাহার এই নূতন বেশ দেখিয়া হাসিয়া অধীর হইল। বিনোদও খুব হাসিতে লাগিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একগাছা 'নোঁয়া'ও স্ত্রীর বাম হস্তে পরাইয়া দিল।

ইহার কয়েক দিন পরে দুইজনে কাশী যাত্রা করিল। ভোরবেলা কাশীতে পৌঁছিয়া, ষ্টেসন হইতে গাড়ী ভাড়া করিয়া, পিসিমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, বিনোদ মহাশ্বেতাকে ভিতরে পিসিমার কাছে পাঠাইয়া দিল। কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া অবধি বিনোদ মহাশ্বেতাকে নানারকম উপদেশ দিতেছিল। পিসিমার আকৃতি কি রকম, তাহা সে এমন সুন্দর ভাবে মহাশ্বেতাকে বুঝাইয়া দিল যে, মহাশ্বেতা পিসিমাকে জনমে এবং জীবনে কখনও না দেখিলেও, একবার দেখিবামাত্র চিনিতে পারিবে—একটুও ভুল হইবে না। তার পর পিসিমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও বিনোদ স্ত্রীকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিল।

পিসিমা যে বাড়ীতে ছিলেন, সে বাড়ীখানি ছোট, এবং তথায় অন্য লোকজনও বেশী ছিল না। বিনোদকে বিলাতে টাকা পাঠাইতে হইত বলিয়া, বিন্ধ্যবাসিনী নিজের জন্য বেশী অর্থ-ব্যয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; তিনি কাশীতে খুব সামান্য ভাবেই থাকিতেন। বিনোদের বর্ণনা মত পিসিমাকে চিনিয়া লইতে মহাশ্বেতার একটুও কষ্ট হইল না।

বিনোদরা যে সময়ে পিসিমার বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল,

তখন তিনি গঙ্গায় স্নান করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। সহসা একটী পরমা সুন্দরী সুশ্রী বধূ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণতা হইল, এবং তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল। বিন্ধ্যবাসিনী পরমাশ্চর্য্য হইয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা বাছা তুমি?" মৃদু হাসিয়া মহা-শ্বেতা কহিল, "আপনার মেয়ে!" বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! "তোমার নাম কি বাছা?" "মহাশ্বেতা।" "আমার মেয়ে! মহাশ্বেতা! কই বাপু, এ নামে আমার মেয়ে সম্পর্কের কেউ নেই ত! কি সম্পর্কে তুমি আমার মেয়ে গা?" "আমি আপনার ভাইপো-বৌ!" "আমার ভাইপো-বৌ? বিনোদের বৌ তুমি? সে যে মেম বিয়ে করে এনেছে!" তিনি সুলোচনার নাম করিলেন না; কারণ, সে অনেক দিনের বিস্মৃত ঘটনা। সম্প্রতি বিনোদের মেম বিবাহের কথাই অহর্নিশি তাঁহার মনে জাগিতেছিল। মহাশ্বেতা বলিল, "আমিই সেই মেম।"

"তুমিই সেই মেম! ও! তাই বটে তোমার কথার যেন একটু টান রয়েছে! আমি মনে করেছিলুম, তুমি এখানকারই কোন বাঙ্গালীর মেয়ে—বরাবর এদেশে রয়েছ; বাঙ্গলা দেশে কখনও যাও নি,—তাই তোমার কথার একটু টান আছে। তা' তুমি এমন বাঙ্গলা শিখলে কোথা?" "মিঃ মোকার্জ্জির কাছে।" "কি বল্‌লে?" "আপনার ভাইপোর কাছে।" "তা তুমি কি একলা এসেছ; না, তোমার সঙ্গে কেউ এসেছে?

কই, আর কাউকে ত দেখছি না।” “আমার স্বামীও এসেছেন।” “বিনোদ এসেছে! কই, কোথা সে?” “তিনি রাস্তায় আছেন।” “বটে! তিনি নিজে রইলেন রাস্তায়, আর মেম বৌকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে! তাঁর আসতে ভরসা হল না বুঝি?” “হ্যাঁ, তিনি সাহস করছেন না।” “আচ্ছা, আমি তাকে ডাকাচ্ছি। ওরে সন্মতিয়া,—না, থাক। সে চিনবে কি করে—বিনোদকে কখনও দেখে নি ত সে! আমিই ডেকে আনছি। তা’ তুমি বোসো মা, আমি এখনই আসছি।” বলিয়া তিনি সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। বিনোদ সদর দরজার ঠিক পাশেই রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিল। বিন্ধ্যবাসিনী সদর দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া রাস্তার এদিকে ওদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিতেই বিনোদকে দেখিতে পাইলেন। বিনোদকে দেখিয়াই তাঁহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, “হ্যাঁ রে বিনু, তোরও মনে শেষে এই ছিল! তোর বাপ এক কীর্ত্তি করলে, সেই জন্যে বাড়ী ছেড়ে কাশীতে পালিয়ে এলুম; আবার তুই আর এক কীর্ত্তি করে বসলি! তুই কি এবার আমাকে পৃথিবী থেকে তাড়াতে চাস্?” “চুপ কর পিসিমা, আগেকার বৌয়ের কথা যেন এ বৌ টের না পায়—তা’হলে আর রক্ষে থাকবে না।” “তুই একে সে কথা বলিস নি?” “তা’হলে কি একে বিয়ে করতে পারতুম?” “ও মা! কি ঘেন্নার কথা! তুই আবার আজ-কাল লুকোচুরিও শিখেছিস্ যে! তা’ দেখ, আমি না হয় না

বললুম—তোর খাতিরে মুখে ওলোপ দিয়েই না হয় রইলুম। কিন্তু জেনে রাখিস, ধর্ম্মের ঢাক একদিন বাজবেই বাজবে। এত বড় একটা কথা ওর কি জানতে বাকী থাকবে? তুই কার মুখে চাবি দিয়ে রাখবি? তা' এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? ভেতরে যাস নি কেন? সাহস হল না বুঝি? তাই বৌকে পাঠানো হয়েছে পিসিমার মন বুঝতে! নে, ভেতরে চল।" "সত্যি পিসিমা, আমার বড় ভয় হয়েছিল।" "তবে এলি কেন?" "না এসেই বা কি করি। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? তুমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দাও।" "আমি কি ব্যবস্থা করব? আমার ত কিছু নেই।" "সে তুমি জান।" "আচ্ছা, সে হবে এখন,—তুই এখন বাড়ীর ভেতরে চল—বৌ একলাটি রয়েছে। ঝি মাগীকেও দেখতে পাচ্ছি না।" পিসিমা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন; বিনোদও তাঁহার পিছু পিছু আসিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল; এবং এতক্ষণে অবসর পাইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া পিসিমাকে প্রণাম করিয়া, পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। পিসিমা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ষাট, ষাট! বেঁচে বর্ত্তে থাক। বৌ নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর।" এই সময়ে তাঁহার মহাশ্বেতার প্রতি নজর পড়িল। কহিলেন, 'ও কি বৌ-মা, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ? ওমা, তাই ত! আমারই ভুল হয়েছে,—বসবার যায়গা দেওয়া হয় নি।" বলিয়া দালানের আলনা হইতে একখানা পাট-করা সতরঞ্চি পাড়িয়া মেঝেয়

বিছাইয়া দিতে উদ্যত হইলে, বিনোদ তাঁহার হাত হইতে সতরঞ্চি কাড়িয়া লইয়া, মেঝেয় পাতিয়া, মহাশ্বেতাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল, এবং নিজেও তাহার উপর উপবেশন করিল। পিসিমা তাহাদের নিকটেই মেঝেয় বসিয়া কহিলেন, "আমি নাইতে যাবার উয্যুগ করছিলাম, এমন সময়ে তোর বৌ এসে আমাকে প্রণাম কর্‌লে, আমার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলে। আমি মনে করলুম, মেয়েটি কে? দিব্বি সুন্দরী; আবার বৌ মানুষ; কই একে ত কখনো দেখি নি। এ এসে আমাকে প্রণাম করে কেন! তা' মেমসাহেব এত বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের আদব-কায়দা শিখলে কেমন করে? আবার বাঙ্গলাও ত ঠিক আমাদেরই মতন কয়। তবে একটু টান আছে, এই যা কথা। তা'হোক মেমসাহেব,—দিব্বি বৌটি কিন্তু।"

বিনোদ কহিল, "ওকে অনেক কষ্টে হাতে ধরে তৈরী করেচি। ও বেশ রাঁধতেও শিখেছে। আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের অনেক রকম রান্না জানে। তোমার হবিষ্যি পর্য্যন্ত রেঁধে দিতে পারবে। তুমি ওর হাতে খাবে?" "রক্ষে কর বাছা। তোর বৌ কিছু নিন্দের হয় নি, তা আমি মেনে নিচ্ছি। তা'বলে আমি আর ওর হাতে খেতে পারব না। আর ছোঁয়া-ন্যাপাও করতে পারব না বাপু। এখনও আমার নাওয়া হয় নি তাই রক্ষে। অন্য সময় যেন ছোঁয়া-ন্যাপা না করে—তুই বুঝিয়ে দিস বৌমাকে।" "সে সব ও কতক কতক জানে; বাকী সব আমি বুঝিয়ে দোবো

এখন, সে জন্যে তোমার কোন ভয় নেই পিসিমা। এখন তুমি আমার কি উপায় করছ, বল।” “সে যাহা হয় হবে এখন, তার জন্যে তুই কিছু ভাবিস না—আমি একটা ব্যবস্থা করেই দোবো এখন। এসেছিস, দু'দিন যাক—ভেবে চিন্তে দেখি—তোর সঙ্গে পরামর্শ করি—তোর বাপকে লিখি!” “আমরা এখানে থাকলে তোমার কষ্ট হবে না, পিসিমা?” “আমার আর কষ্ট কি? আমি বিধবা মানুষ। তোদেরই বরং কষ্ট হবে। তা' তোরা না হয় দু'চার দিন পরেই কলকেতায় ফিরে যাস। বাপের সঙ্গে দেখা করেছিলি?” “না পিসিমা। তোমার সঙ্গেই যখন দেখা করতে ভরসা হয় নি—তখন কি আর ফস্ করে বাবার কাছে যেতে পারি?” “তা বটে,—চিরকাল যেমন পিসিমার আড়ালে আড়ালে কাটিয়ে এসেছিস—এখনও পিসিমা আড়াল করে না দাঁড়ালে বাপের কাছে যেতে ভরসা করছে না, তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। তা' তোরা এইখানে একটু বোস, আমি চট করে মা গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আস্‌ছি। যাব আর আসব—গঙ্গা খুব কাছেই—বেশী দেরী হবে না। তার পর এসে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতে হবে। তখন দেখব, তোর মেম বৌ কেমন রাঁধতে শিখেছে।”

২৪

পিসিমার চেষ্টায় এবং মধ্যস্থতায় বিনোদ সস্ত্রীক পিতার বাগান বাটীতে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ইহাতেও কিন্তু তিনি নিষ্কৃতি

লাভ করিতে পারেন নাই ; তিনি কাশীর বাস উঠাইয়া আবার ভাইয়ের সংসারে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন—বিনোদ, বিশেষতঃ মহাশ্বেতা কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়ে নাই। বিনোদ ও মহাশ্বেতা যে কয় দিন কাশীতে তাঁহার কাছে ছিল, সেই কয় দিনেই মহাশ্বেতার ব্যবহারে তিনি মুগ্ধা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিনোদলালের উচ্চ শিক্ষা লাভ,—বহু অর্থব্যয়ে ব্যারিষ্টারি পাশ—এ সব কিছুই কাজে লাগিল না। সে খায় দায়, আর পরম নিশ্চিন্ত ভাবে বাগানের পুকুরে সমস্ত দিন ধরিয়া মাছ ধরে। না হয় নবেল পড়িয়া কাটাইয়া দেয়। কিন্তু জন্মগত সংস্কার বশতঃ, শ্বশুরেরও একান্ত গলগ্রহ হইয়া থাকা মহাশ্বেতার ভাল লাগিল না। তাই সে শ্বশুরের কাছে প্রস্তাব করিল, সে সুশীল এবং বিধুভূষণের এ পক্ষের সন্তানগুলির লেখাপড়া ও তদারকের ভার লইবে। তাহার বিদ্যার খ্যাতি বিধুভূষণও শুনিয়াছিলেন, এবং তাহার মধুর ব্যবহারেও তিনি প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি হৃষ্ট চিত্তে পুত্রবধূর প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। মহাশ্বেতার তত্ত্বাবধানে সুশীলার লেখাপড়া দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে লাগিল।

মহাশ্বেতা হিন্দুকুলনারীর আচার ব্যবহার যতটা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাই সম্বল করিয়া, সে সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে হিন্দু গৃহস্থের বধূর মত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। রাঁধুনির অসুখ করিলে সে রন্ধনশালার ভার লইত, এবং ডাল, ভাত, শাক, চচ্চড়ি, ডালনা রাঁধিয়া সকলকে

খাওয়াইত। ঝিয়ের অসুখ করিলে সে বাসন পর্য্যন্ত মাজিতে ইতস্ততঃ করিত না। সিঁদূর ত সে পরিতে আরম্ভ করিয়াছিলই; অধিকন্তু, সধবা ও কুমারীদিগকে আলতা পরিতে দেখিয়া, সেও মধ্যে মধ্যে আলতা পরিত। বিনোদ বিলাত-প্রবাস কালে যে সকল বিলাতী আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হইয়াছিল,—স্ত্রীর দেখাদেখি, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে গোঁড়া হিন্দু হইয়া উঠিতেছিল।

এইরূপে এই পরিবারের দিন কাটিতে লাগিল। মহাশ্বেতা ক্রমে চারিটি সন্তানের জননী হইল। তন্মধ্যে প্রথমটি হইল কালো, অপর তিনটি হইল তাহারই মত ফরসা। বিধাতার লীলা অতি বিচিত্র। জ্যেষ্ঠটি হইল পিতার খুব অনুগত। অপর তিনটি মাতার ন্যাওটো হইল।

এইখানে আমাদের আখ্যায়িকা শেষ করিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাই ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে বিধুভূষণের সংসারে আরও একটা ওলট পালট হইয়া গেল। এবং সে সংবাদটা না দিলে পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি অবিচার করা হয়, ভয়ে, আমরা এইখানেই আমাদের আখ্যায়িকা শেষ করিতে পারিলাম না।

২৫

ইদানীং বিনোদের একটী নূতন বন্ধু জুটিয়াছিল। প্রকাশের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল,—বরং একটু সম্পন্ন বলিলেও চলে। দেখিতে

অতি সুপুরুষ, বয়সও বেশী নয় ; কিন্তু বিপত্নীক। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহার পত্নী কালো ছিল। কালো বলিয়া প্রকাশ তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না ; বাড়ীর অন্যান্য লোকও বধূকে অনাদর করিত। এই রূপ অনাদর উপেক্ষায় মনের দুঃখে তরুণ যৌবনে পিতা-মাতার বড় আদরের মৃণালিনী জ্বলন্ত অনলে আপনাকে আহুতি দিয়া স্বামী ও শ্বশুর-কুলকে নিষ্কৃতি দিয়া পরলোকে প্রস্থান করিল। হায়, এমনি ভাবে কত নারী-জীবন যে আমাদের সমাজে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—নিষ্ঠুর আত্মীয়-স্বজনের নির্ম্মম আঘাতে কত তরুণ হৃদয় যে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে —কত তরুণী যে এই আঘাত সহিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইতেছে—কত নারী এই আঘাতের বেদনায় জীবন্মৃত হইয়া কোন রকমে দিন যাপন করিতেছে—কে তাহার হিসাব রাখে।

বধূমাতার শোচনীয় অকাল মৃত্যুর পর প্রকাশের জননী পুত্রের আবার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু প্রকাশ বাঁকিয়া দাঁড়াইল। এবার সে নিজে না দেখিয়া বিবাহ করিবে না। কেবল চোখের দেখা নহে—কেবল রূপের পরীক্ষা নহে—সে যাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিবে, তাহার অন্তর বাহিরের সম্যক পরিচয় না লইয়া সে কখনও বিবাহ করিবে না। অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা প্রকাশ-জননীর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, প্রকাশের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ধন্য হইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল ; কিন্তু প্রকাশের সঙ্কল্প শুনিয়া পিছাইয়া

গেল—সুদীর্ঘ কাল 'কোর্টসিপে'র পর কন্যার বিবাহ দিবার উৎসাহ তাহাদের রহিল না।

প্রকাশের সহিত বিনোদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। সেই সূত্রে উভয়েই উভয়ের বাটীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে বিনোদ প্রকাশদের বাড়ীর সকলের কাছে এবং প্রকাশও বিনোদের পরিবারবর্গের নিকটে পরিচিত হইয়া পড়িল।

স্বভাব-সুন্দরী সুশীলা নব-যৌবন-বিকাশে আরও লাবণ্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে। দাদা ও বৌ-দিদির যত্নে সে বিলক্ষণ সুশিক্ষিতাও হইয়াছে। ইংরেজী ও বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত সে উত্তমরূপে শিখিয়াছে। মহাশ্বেতা তাহাকে একটু একটু ফরাসী ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইতিহাস ভূগোল, গণিত প্রভৃতিও তাহার কিছু কিছু শিক্ষালাভ হইয়াছে। প্রকাশ ভাবিল, যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে এমনি পাত্রীকেই বিবাহ করা উচিত। বিধুভূষণ এবং তাঁহার পরিবারের লোকেরাও সকলেই বুঝিলেন, রূপে গুণে, কুলে শীলে, বিষয়-সম্পত্তিতে, বংশ-মর্য্যাদায় এই ছেলেটি সুশীলার সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্র। উভয় পক্ষের মনের ভাব যখন এইরূপ, তখন সেটার বাহিরে প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু আবার, উভয় পক্ষের মনই একটু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। বিধুভূষণের পক্ষ হইতে এই আপত্তি উঠিল যে, যাহার স্ত্রী স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকদের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পাইয়া, মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার হাতে কন্যা

সম্প্রদান করিলে মেয়ে কি সুখী হইতে পারিবে? প্রকাশ লোক দিয়া মায়ের কাছে এই পাত্রীর কথা পাড়িয়াছিল। তিনি সকল কথা শুনিয়া এবং সংবাদ লইয়া বলিলেন, যে লোক বুড়া বয়সে বিধবা বিবাহ করিয়াছে, যাহার ছেলে এক স্ত্রী সত্ত্বেও বিলাত হইতে মেম বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, তাহার কন্যাকে কেমন করিয়া বৌ করি।

নিজের অবস্থা ভাবিয়া বিনোদ বন্ধুর পক্ষ লইল। সে পিতাকে বুঝাইল যে, পাত্রটী সর্ব্বাংশে সুপাত্র। এ পাত্র হাতছাড়া হইলে, তাহাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায়, এ রকম দ্বিতীয় পাত্র মেলা দায় হইবে। বিশেষতঃ, প্রকাশ সুশীলাকে ভালবাসে; এবং সে যতদূর লক্ষ্য করিয়াছে—সুশীলাও প্রকাশের প্রতি অপ্রসন্না নহে। বিনোদ হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করিতে না পারিলেও, তাহার ব্যারিষ্টারি বিদ্যা অন্ততঃ এই একটা ক্ষেত্রে কাজে লাগিল—সে পিতাকে রাজী করিল।

মাতার কাছে আমল না পাইয়া প্রকাশ মাতুলের শরণ লইল। মামা ভাগিনেয়কে খুব ভালবাসিতেন। তিনি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নেই; আমি দিদিকে রাজী করিব।" একদিন তিনি নিজে প্রকাশের সঙ্গে গিয়া সুশীলাকে দেখিয়া আসিলেন; এবং ফিরিয়া আসিয়া দিদির কাছে সুশীলার অজস্র প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "ছেলে একেই বিয়ে করতে রাজী নয়। ও যখন নিজে পছন্দ করে বিয়ে করতে চাচ্চে, তখন তুমি অমত কোরো না। করলে হয় ত ছেলের মন এমন

ভেঙ্গে যাবে যে, আর মোটেই বিয়ে করতে চাইবে না। আজকালকার ছেলেদের জান ত!" প্রকাশের জননী বিবাহে সম্মতি দিলেন;—প্রকাশ যে তাঁহার একমাত্র সন্তান।

বিবাহের কথা পাকাপাকি হইতে কিন্তু আর এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রকাশদের পাড়ার লোকেরা এই বিবাহের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, হিন্দু সমাজে ও-রকম ম্লেচ্ছ আচার চলিবে না। ইহাতেও যখন বিবাহ প্রস্তাব ভঙ্গ হইল না, তখন তাঁহারা প্রকাশ ও তাহার পরিবারবর্গকে একঘরে করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রকাশ আবার তাহার ধনী মাতুলের আশ্রয় লইল।

প্রকাশচন্দ্রের মাতুল ব্যবসায়ে বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তিনি বলিলেন, "তোমার ইচ্ছে হয়েছে, তুমি বিয়ে করবে; কুছ পরোয়া নেই। সমাজ কিছু বল্লে, সমাজকে দেখে নেবো।" পল্লীগ্রামের সমাজ হইলে তাঁহার এই দর্প তিনি কতখানি বজায় রাখিতে পারিতেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু, এটা না কি কলিকাতা সহর—এখানে সমাজ বলিয়া একটা বস্তুর না কি সম্পূর্ণ অভাব—তাই তাঁহার দর্প সাজিল—বিবাহে বাধা পড়িল না।

২৬

বিবাহ হইল বটে, কিন্তু পাড়ার লোকে এই বিবাহে যোগ দিল না; পাড়ার একজনও প্রকাশদের বাড়ীতে পাতা পাড়িল না, অথবা বরযাত্রী হইয়া গেল না। পাড়া-প্রতিবাসীর এই

উপেক্ষার ভাব প্রকাশের জননীর প্রাণে বড় বাজিল; এবং ভবিষ্যতের ভাবনায় তিনি অধীরা হইয়া উঠিলেন; ভ্রাতার কাছে অনুযোগ করিলেন, পাড়ার লোকের অমতে এ বিবাহ না হইলেই ভাল হইত। প্রকাশের মাতুল বলিলেন, "কিছু ভয় নেই দিদি। এ কলকেতা সহর—এখানে কার সাধ্য তোমাকে কিছু বলে, কিম্বা তোমাদের কোন অনিষ্ট করে। পাড়ার লোকে এল না,—বয়ে গেল। আমি তাদের দেখে নিচ্ছি।" বলিয়া তিনি সম্পূর্ণ নিজের ব্যয়ে বৌ-ভাতের বিরাট আয়োজন করিলেন; এবং তাঁহার যেখানে যে কোন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ছিল, স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন—পাড়ার লোককে দেখাইবেন, তাঁহারা না আসিলেও তাঁহার ভাগিনেয়ের বিবাহ আটকাইবে না, এবং পাতা পাড়িবার লোকেরও অভাব হইবে না।

পিসিমার প্রতিশ্রুত বিনোদের ধর্ম্মের কল নড়িবার সময় আসিয়াছে—বাতাস বহিতেছে। প্রকাশের মামার বাড়ীর কুটুম্বের সম্পর্কে সুলোচনা নিমন্ত্রিত হইয়া প্রকাশদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। কে বর, কে কনে—তাহা সে কিছুই জানিত না। কৌতূহলবশতঃ বধূর মুখ দেখিতে গিয়া, সুলোচনা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "সুশি, তুই!" সুশীলাও বৌ-দিদিকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিতা হইল এবং পুরাতন বন্ধু পাইয়া আলাপে প্রবৃত্তা হইল।

বলা বাহুল্য, বিধুভূষণের বাড়ীর সকলেই—ঝায় চাকর

বাকর ইঁদুর বেরাল টিকটিকিটি পর্য্যন্ত সুশীর বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিল। এই সামাজিক 'বয়কটে'র ব্যাপারে হার জিত লইয়া এ পক্ষের সকলেরই জেদ খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। কাজেই, মূল বিবাহে যত না ঘটা হইয়াছিল,—তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক আড়ম্বরের সহিত বিবাহের আনুষঙ্গিক বৌ-ভাতের আয়োজন হইয়াছিল—শুধু পাড়াপড়শীর চোখে আঙুল দিবার জন্য। এবং অনুষ্ঠানটি যাহাতে সফল হয়, সে পক্ষে সকলেই যত্নশীল ছিলেন—নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কেহই ইতস্ততঃ করেন নাই।

সুশীলাকে একটি মহিলার সহিত একান্তে কথোপকথনে নিযুক্তা দেখিয়া, মহাশ্বেতা তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে ভাই?" সুশীলা কহিল, "জান না? তা' তুমি জান্‌বেই বা কেমন কোরে! ইনি তোমার সতীন!" এই বলিয়া সে একটু হাসিল। মহাশ্বেতা 'তোমার সতীন' কথাটি বুঝিতে পারিল না; কারণ, এই সতীন কথাটি সে কখনও শুনে নাই, এবং তাহার অর্থও সে জানে না। বিনোদের কাছে যখন সে বাঙ্গলা শিখিয়াছিল—সে তাহার নিজের ভাষার মধ্য দিয়া। তাহাদের সমাজে সতীনের পাট নাই এবং ঐ অর্থ-বোধক কোন প্রতিশব্দও তাহাদের ভাষায় নাই। আর প্রসঙ্গ ক্রমেও ইহার অর্থ শিখিবার তাহার সুযোগ ঘটে নাই। অথবা এমনও হইতে পারে,—বিনোদ ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে এই কথাটি শেখায় নাই—হয় ত ধরা পড়িবার ভয়ে। এখন

সুশীলার মুখে 'তোমার সতীন' কথা শুনিয়া সে মনে করিল, 'সতীন' বুঝি ঐ মেয়েটির নাম ; এবং সুশীলা ঐ মেয়েটির সহিত তাহার পরিচয় (introduce) করাইয়া দিল। তাই সে কহিল, "ভাই সতীন, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় সুখী হলাম!" সুলোচনা কিন্তু মহাশ্বেতার সহিত তাহার সম্পর্ক এক মুহূর্ত্তেই বুঝিয়া লইল। সে শুনিয়াছিল, বিনোদ মেম বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, এবং শুনিয়া অবধি সে আবার স্বামীর ঘর করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিল। কিন্তু সেই মেম যে এমন হইতে পারে, তাহা সে প্রত্যাশা করে নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া সতীনের কাছে স্বভাবতঃই তাহার সঙ্কুচিত হইবার কথা। এদিকে বাঙ্গালীর মেয়ের সাজে মেম সাহেবকে দেখিয়াও সে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়াছিল। তাই সে কতকটা সঙ্কোচে, কতকটা বিস্ময়ে, মহাশ্বেতার কথার জবাব না দিয়া, একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল। সুলোচনা কথার জবাব দেয় না দেখিয়া মহাশ্বেতা আবার করিল, "ভাই সতীন, কথা কইচ না কেন ভাই? আমি যে তোমাদেরই একজন—সুশীলা হচ্চে আমার ননদ। আর তুমি যখন সুশীর বন্ধু, তখন আমারও বন্ধু।" সুলোচনা এবারও কোন জবাব দিল না। তখন সুশীলা বলিল, "জবাব দে না ভাই বৌদি! তোর সতীন তোর সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্চে, কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন ভাই?" "বৌদি!" মহাশ্বেতা 'বৌদি' কথাটির মানে খুব ভাল রকমই জানিত। সুশীলা তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টা 'বৌদি' বলিয়া ডাকিত।

সে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, সুশীলার 'বৌদি' ত আমি। সুশীলার ভাই ত বিনোদ। বিনোদ ছাড়া সুশীলার আর কোন ভাই আছে না কি, যাহার সঙ্গে এই মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে! সে কহিল, "ইনি তোর কোন ভায়ের বৌ রে?" "আমার আবার ভাই কটা! ইনি ত আমার দাদার বৌ!" "তোর দাদার বৌ ত আমি।" "তুমিও,—ইনিও। ইনি দাদার বড় বৌ, তুমি ছোট বৌ।" "তোর দাদার আগে আবার বিয়ে হয়েছিল না কি?" "জান না তুমি? দাদা তোমাকে বলে নি সে কথা? দাদা এ বৌ নিয়ে ঘর করতে চায় না বলেই ত তোমাকে বিয়ে করে এনেছে।" "কই, আমি ত কিছুই জানতাম না—কোন কথাই ত শুনি নি। তোর দাদা আমাকে কিচ্ছুই বলে নি। উঃ! কি ঠক!"

সুশীলা ও সুলোচনা উভয়েই ভীত হইল। সকলের অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছায় এই যে একটা অনিষ্ট হইয়া গেল, ইহার প্রতিকারের তখন আর কোনই উপায় ছিল না।

২৭

সুলোচনার সহিত আলাপ জমাইয়া লইতে মহাশ্বেতার কিছুই অসুবিধা হইল না। সুশীলা ও সুলোচনার মুখে সে বিনোদের প্রথম বিবাহের ও পত্নীত্যাগের সমস্ত কাহিনী খুঁটিয়া খুঁটিয়া শুনিয়া লইল। কয় বৎসর বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়া সে দেখিয়াছিল, এদেশের মেয়েরা সুন্দর ও কালো দুই হইয়া থাকে। এবং দুই একজন লোক কালো বৌ পছন্দ না করিলেও, অধিকাংশ

লোকই কালো বৌ লইয়াই সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিয়া থাকে। আর সুলোচনার গায়ের রং কালো হইলেও, তাহারি অন্তরটি যে খুব সুন্দর তাহা সে সুলোচনার সহিত কিছুক্ষণ আলাপেই বুঝিয়া লইল। এবং সুশীলাও বড় বৌদিদির বিদ্যা, গীত-বাদ্য-নিপুণতা, এবং দাদার বিলাত যাত্রার প্রস্তাবে নিজের গায়ের সমস্ত গহনা খুলিয়া দিবার কথা মহাশ্বেতাকে শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না। অতএব সুলোচনা তাহার সতিনী হইলেও তাহার প্রতি মহাশ্বেতার একটু সহানুভূতিরই উদ্রেক হইল। কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া সে শিহরিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল।

প্রকাশদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিতা হইয়া যে সকল মহিলা আসিয়াছিলেন, তাহারা আহারাদি সারিয়া সন্ধ্যার একটু পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সুরু করিলেন। সন্ধ্যার কিছু পরেই মেয়েরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন; মহাশ্বেতা, তাহার শাশুড়ী এবং ছেলেপুলেরা সকলেই বাড়ী ফিরিল। গভীর রাত্রিতে বিনোদ যখন বাড়ী ফিরিয়া নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল, দেখিল, মহাশ্বেতা তখনও শয়ন করে নাই—বসিয়া আছে। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া বিনোদ চমকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। এ কি মূর্ত্তি! এলিজাবেথ রূপে তাহার সঙ্গে আলাপ হইয়া অবধি,—মহাশ্বেতা রূপে তাহার সঙ্গে কয় বৎসর একত্র বাস করিয়া—বিনোদ কখনও তাহার এ মূর্ত্তি দেখে নাই। যাহাকে সে কুসুমের ন্যায় কোমলা রূপেই এতদিন দেখিয়া আসিয়াছে, আজ সে বজ্রাদপি কঠোর! আজ তাহার ভিতরে ভিতরে সুপ্ত

বৃটিশ সিংহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—সে সিংহীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়াছে।

স্ত্রীকে প্রসন্না করিবার নিমিত্ত অতি কোমল কণ্ঠে বিনোদ ডাকিল, "বেথ্‌সি, ডিয়ার !"

এলিজাবেথ যে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতে এতদিন ধরিয়া অভ্যাস করিতেছে, স্বামী ও তাঁহার পরিজনদিগের সহিত যে বাঙ্গলা ভাষাতেই কথা কহিয়া সে আনন্দ পাইত, সে আজ সেই বাঙ্গলা ভাষা ভুলিয়া গেল ; নিজের মাতৃভাষাতে বলিল, "তুমি আমার কাছে আসিয়ো না।"

বিনোদ নূতন কুটুম্ব-বাড়ীতে বাহিরে বাহিরেই ছিল— ভিতরের কোন খবর সে জানিত না। তাহার পূর্ব্ব স্ত্রী সুলোচনা যে কোন সূত্রে এ বাড়ীতে আসিতে পারে, এমন সন্দেহ কল্পনাতেও তাহার মনে উদয় হয় নাই। মহাশ্বেতার সহিত সুলোচনার যে সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়া গিয়াছে, এ খবর সে পায় নাই। হয় ত ইংরেজ-কন্যা বলিয়া তাহাকে কেহ কোনরূপ অপমান করিয়া থাকিবে ভাবিয়া, সে ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য সভয়ে প্রশ্ন করিল, "কেন, কি হইয়াছে ?"

দৃপ্তা সিংহীর ন্যায় উত্তেজিত ভাবে, কর্কশ কণ্ঠে মহাশ্বেতা কহিল, "কি হইয়াছে ! কিছু জান না না কি ! তোমরা মনকে জিজ্ঞাসা কর, কি হইয়াছে ! ঠক, প্রবঞ্চক, জুয়াচোর, প্রতারক !"

অকস্মাৎ অকারণে এইরূপ গালি খাইয়া বিনোদও চটিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল ; এবং নিজের সিংহ বিক্রম দেখাইবার

চেষ্টা করিয়া পরুষ কণ্ঠে কহিল, "কি হইয়াছে, আগে বল শুনি। কিসে আমি ঠক, জুয়াচোর, প্রবঞ্চক হইলাম ?"

"আজ তোমার সুলোচনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে !"

"সুলোচনা !" "হাঁ, তোমার পূর্ব্ব-স্ত্রী !" তার পর বাঙ্গলায় বলিল, "আমার সতীন !" এবং শ্লেষ-মিশ্রিত স্বরে কহিল, "আজ একটা নূতন বাঙ্গলা কথা শিখিয়াছি—'সতীন !' এ কথা আমার মাতৃভাষাতে নাই !"

কোথায় গেল বিনোদের সিংহ-বিক্রম। সে তো জুয়াচোরই বটে ! অত্যন্ত কোমল হইয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ সুরে বিনোদ বলিল, "আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম। তা' ছাড়া, তোমাকে দেখিবার অনেক আগে,—আমার বিলাত যাত্রারও আগে আমি তাহাকে ত্যাগ করেছিলাম; তুমি বিশ্বাস কর, আমি একদিনের জন্যও তাহাকে গ্রহণ করি নাই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

"আমি ক্ষমা করিলে কি হইবে,—তোমায় আমায় আর একত্র থাকা চলিতে পারে না। আর সে বেচারীর অপরাধ কি। সে খাসা মেয়ে—আমি তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি। আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্র স্নেহ থাকে, তবে তুমি তাহাকে গ্রহণ কর—তাহার সহিত ঘর-কন্না কর। আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়া যে পাপ করিয়াছ,—সুলোচনাকে গ্রহণ কর, তবেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আর আমার আশা তুমি ত্যাগ কর। আমি আর এক দণ্ডও তোমার বাড়ীতে

—এ বাঙ্গলা দেশে তিষ্ঠিতে পারিব না। আমি আমার স্বদেশে চলিয়া যাইব।"

"তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে আমি বাঁচিব না।"

"বাঁচ আর মর, আমি তাহা কিছুই জানি না। কি দোষে তুমি সুলোচনাকে ত্যাগ করিয়াছ? তুমি তাহাকে গ্রহণ কর নাই—তবু আজও তোমার প্রতি সুলোচনার কত শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-ভালবাসা দেখিলাম। রূপটাই কি সর্ব্বস্ব? গুণ কি কিছুই নয়? সুলোচনার মত গুণবতী মেয়ে আমি খুব কমই দেখিয়াছি।"

বিনোদ সে কথা কাণে না তুলিয়াই কহিল, "আমি তোমাকে বড্ড ভালবাসি—তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইয়ো না।"

মহাশ্বেতা বলিল, "আমিই কি তোমাকে কম ভালবাসিয়াছিলাম? তোমার মনের মত হইবার জন্য—ইংরেজের মেয়ে আমি—সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর মেয়ে হইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি কি তোমাকে কম ভালবাসি? তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে; তবু আমি তোমার সঙ্গে আর বাস করিতে পারিব না—আমার জন্মগত সংস্কার আমায় বাধা দিবে। হয় ত আমাদের আইন অনুসারে আমাদের বিবাহই অসিদ্ধ হইয়াছে।"

বিনোদের ব্যারিষ্টারি বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে যুক্তি তর্কের আশ্রয় লইতে গেল; কহিল, "তা কেমন করিয়া হইবে;

সুলোচনাকে তোমাদের আইন অনুসারে আমি বিবাহ করি নাই। তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম হিন্দু আইন অনুসারে। হিন্দু আইনে যত খুসী বিবাহ করিলেও কোন দোষ হয় না।"

মহাশ্বেতা বলিল, "হিন্দু আইন অনুসারে যাহাকে তুমি বিবাহ করিয়াছ, হিন্দু আইন অনুসারেই তুমি তাহাকে ত্যাগও করিতে পার না—জীবনে মরণে সে তোমার স্ত্রী। সুতরাং তোমার এক স্ত্রী—যাহাকে তুমি কোন মতে ডাইভোর্স করিতে পার না—বর্ত্তমান থাকিতে, আমাদের আইন অনুসারে আমাকে বিবাহ করিয়া 'বিগামি'র অপরাধ করিয়াছ। আমাদের আইন অনুসারে তুমি দণ্ডের যোগ্য। কিন্তু আমি সে সকল কিছুই করিব না ; এবং তোমার সঙ্গে আর স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাসও করিতে পারিব না।"

"ইহাই তোমার স্থির সঙ্কল্প ?"

"স্থির। আজ হইতে আমরা পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিচ্ছিন্ন হইলাম। কাল হইতে তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবে না।"

"ছেলেগুলির কি হইবে ?"

"তোমার ছেলে তোমার কাছে থাকিবে—আমার ছেলে তিনটি আমার কাছে থাকিবে। বড়টি তোমাকে ভালবাসে, তোমার কাছে থাকিতে তাহার কষ্ট হইবে না—সে তোমার কাছেই থাকুক। আর ছোট তিনটি আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না—উহাদের আমি সঙ্গে লইয়া যাইব।"

"খরচপত্রের কি হইবে ?"

"সেজন্য তোমার ভাবনা নাই—আমি তোমার কাছ হইতে আর এক পয়সাও লইব না।"

"কিন্তু আমি যে তোমার কাছে অনেক টাকার জন্য ঋণী, বেথ! আমি তো সে টাকা এখন শোধ করিতে পারিতেছি না— আমার হাতে তো কিছুই নেই।"

"সে টাকার জন্যও আমি তোমাকে কিছুমাত্র পীড়াপীড়ি করিতেছি না। যদি কখনও তোমার হাতে টাকা হয়, আর আমার টাকা পরিশোধ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সে টাকা তুমি তোমার ছোট তিনটি ছেলের নামে কোন দাতব্য কার্য্যে দান করিয়ো।"

"তুমি কোথায় যাইবে ?"

"আমি ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইব।"

"সেখানে কাহার আশ্রয়ে থাকিবে ?"

"কেন, আমার পিতা মাতার আশ্রয়ে !"

"তাঁহারা যদি তোমাকে গ্রহণ করিতে না চান ?"

"তাঁদের একমাত্র সন্তান আমি—কত স্নেহের পাত্রী আমি তাঁদের—আমায় তাঁরা গ্রহণ করিবেন না ?"

"কিন্তু তুমি তাঁদের অমতে আমাকে বিবাহ করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছ। এতদিনের মধ্যে একখানিও পত্র ব্যবহার কর নাই তাঁদের সঙ্গে !"

"ইংল্যাণ্ড বাঙ্গলা দেশ নয়—ইংরেজ জাতি বাঙ্গালী নয়।

আমাদের দেশে এরকম ঘটনা একটুও অস্বাভাবিক নয়—ইহাতে তাঁহাদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইবার আমার একটুও ভয় নাই।"

"কিন্তু তাঁহারা যদি বর্ত্তমান না থাকেন? এতদিন তাঁদের কোন খবরাখবর নাই—ইতোমধ্যে যদি তাঁহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে?"

"সেজন্য তোমাকে কিছুমাত্র চিন্তিত হইতে হইবে না। আমার দেশে আমি যেখানে হউক একটা আশ্রয় পাইবই।"

"কোথায়,—রিচার্ড ম্যাকনীলের কাছে?"

মহাশ্বেতা এবার ভয়ানক ক্রুদ্ধা হইয়া কহিল, "পাষণ্ড! তুমি আমার কেবল ক্ষতি করিয়াই ক্ষান্ত নও- আবার আমাকে অপমান করিতেছ? তুমি এখনই আমার সামনে হইতে দূর হইয়া যাও—নচেৎ মহা অনর্থ ঘটিবে।"

২৮

লণ্ডন! আবার আমরা লণ্ডনে! মহাশ্বেতা পুত্র তিনটিকে লইয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন আর সে মহাশ্বেতা নয়—এখন সে আবার আগেকার সেই এলিজাবেথ হইয়াছে।

যে রাত্রিতে বিনোদের সহিত তাহার কলহ হয়, তাহার পরদিন ভোর বেলাই সে তাহার শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া পুত্র তিনটি সহ তাহার অধ্যাপক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। এবং তাঁহার সাহায্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া তাহার স্বদেশ যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিল।

লণ্ডনে পৌছিয়াই সে তাহার পিতামাতার কাছে চলিয়া

গিয়াছিল। তাঁহারা তখনও বর্ত্তমান ছিলেন, এবং তাঁহাদের ক্রোড় হইতে অপহৃতা কন্যাকে ফিরাইয়া পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন, এবং পুত্রী ও দৌহিত্রগণকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তাহার মুখে তাহার কাহিনী শুনিয়া, বিনোদ এবং বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় মনে ব্যথা পাইবেন। এই জন্য আমি আর সে সকল কথা এখানে প্রকাশ করিব না।

একজন বিদেশী—বাঙ্গালী—আসিয়া এলিজাবেথকে তাহার হাত হইতে ফাঁকি দিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল দেখিয়া, রিচার্ডের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহার সমস্ত উচ্চাভিলাষ এলিজাবেথের সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের মত উপিয়া গিয়াছিল। সে কারখানার কাজ ত্যাগ করিয়া, বাড়ীর কাছে একটী সামান্য গ্রাম্য স্কুল মাষ্টারি যোগাড় করিয়া লইয়া, নিজ বাটীতে বাস করিতেছিল; এবং বৃদ্ধ প্রেষ্টন-দম্পতির পুত্রস্থানীয় হইয়া তাঁহাদের শোকে সান্ত্বনার স্বরূপ হইয়াছিল। সে সর্ব্বদা বিষণ্ণ, চিন্তাশীল থাকিত; কোন কাজেই তাহার উৎসাহ ছিল না। কোন রকমে দিন কাটাইয়া দেওয়া ছাড়া আর তাহার জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিল না। সে বিবাহও করে নাই—বাল্যসখী এলিজাবেথের স্মৃতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল।

এক্ষণে এলিজাবেথকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, তাহার ভাঙ্গা মন আবার যোড়া লাগিবার আশা হইল; তাহার মুখখানি

আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল—তাহার কার্য্যে আবার উৎসাহ দেখা দিল।

এলিজাবেথের পিতামাতার কাছে সে এলিজাবেথের সকল কথা শুনিল। আবার তাহার আশা হইল, এলিজাবেথ একদিন তাহার স্ত্রী হইতে পারে। সে এলিজাবেথের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। একদিন সে সুযোগ মিলিয়াও গেল। প্রেষ্টন দম্পতি তাঁহাদের তিনটি দৌহিত্রকে সঙ্গে লইয়া কোন একটা তামাসা দেখিতে গেলেন। এলিজাবেথ আর কোন আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে চাহিত না—সে একাই বাড়ীতে রহিল। পথে প্রেষ্টন দম্পতির সঙ্গে রিচার্ডের সাক্ষাৎ হইল। সে তাঁহাদের মুখে শুনিল, এলিজাবেথ একা বাড়ীতে আছে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে সে একটুও বিলম্ব করিল না—তৎক্ষণাৎ প্রেষ্টনদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। এলিজাবেথ তাহাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

এ কথা সে কথার পর রিচার্ড কাজের কথা পাড়িল, "আর কত দিন তুমি একক জীবন যাপন করিবে?"

এলিজাবেথ কহিল, "একা কেন থাকিব। আমার বাপ মা রহিয়াছেন, আমার তিনটি সন্তান রহিয়াছে—আমি একা কি রকম?"

রিচার্ড উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিল, "তুমি আর বিবাহ করিবে না?"

এলিজাবেথ তাহার মনের কথা বুঝিল। রিচার্ড যে তাহারই জন্য আজও বিবাহ করিয়া সংসারী হয় নাই—সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেছে—এই কথা মনে করিয়া সে অতি কাতর কণ্ঠে কহিল, "রিচার্ড, তুমি আমায় ক্ষমা কর; আর আমার আশা করিয়ো না—আমি আর বিবাহ করিব না। আমি কখনও তোমায় ভালবাসি নাই—আর কখনও ভালবাসিতে পারিবও না। আমি সেই পাষণ্ডকে ভালবাসিয়াছিলাম। যদিও তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—কিন্তু তাহাকে এ জীবনে কখনও ভুলিতেও পারিব না। চিরদিন তাহার স্মৃতি পূজা করিয়া, তাহার সন্তান তিনটিকে মানুষ করিব। আমি তোমার দুঃখ বুঝিতেছি; কিন্তু কোন প্রতিকার করিবার আমার ক্ষমতা নাই। তুমি আমায় ক্ষমা কর, রিচার্ড, আমায় ক্ষমা কর।"

উপসংহার।

বিনোদ এলিজাবেথ ওরফে মহাশ্বেতাকে যথার্থই ভাল-বাসিয়াছিল। তাহার আদেশে সে সুলোচনাকে বাপের বাড়ী হইতে আনাইল। আনাইয়াই কিন্তু তাহাকে বলিয়া দিল যে, "আমি মহাশ্বেতার আদেশে তোমাকে আনাইয়াছি। তোমাকে আমি মহাশ্বেতা মনে করিয়াই ভুলিয়া থাকিব। তুমি যেন কখনও আমার এ ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়ো না।"

বহুদিন পূর্ব্বেকার একটা রাত্রির কথা সুলোচনার মনে পড়িয়া গেল। সেই রাত্রে সে স্পর্দ্ধা করিয়া বিনোদকে বলিয়াছিল, "আমি যদি সতী হই, তবে তুমি একদিন আমাকে গ্রহণ করিবে।" কিন্তু বিনোদ এ কথাটা ভুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া, সে তাহার এই ভুলটাও ভাঙ্গিয়া দিল না।

আর পিসিমা? এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি সুলোচনাকে আবার কাছে পাইয়া অত্যন্ত সুখিনী হইয়াছেন।

সমাপ্ত।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই,—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক্ শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

মফস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি একত্র, বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুসারে, পৃথক্ পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৵৹ লাগিবে। অ গ্রাহকদিগের ৵৴৹ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, "**গ্রাহক-নম্বর**" সহ পত্র দিতে হইবে।

১। **অভাগী** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
২। **ধর্ম্মপাল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। **পল্লীসমাজ** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। **কাঞ্চনমালা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৫। **বিবাহবিপ্লব**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল।
৬। **চিত্রালি**—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। **দূর্ব্বাদল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। **শাশ্বতভিখারী** (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। **বড়বাড়ী** (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

১১। **ময়ূখ** (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।
১২। **সত্য ও মিথ্যা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। **রূপের বালাই**—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়। (২য় সং-যন্ত্রস্থ)
১৪। **সোণার পদ্ম** (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। **লাইকা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। **আলেয়া** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। **বেগম সমরু** (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। **নকল পাঞ্জাবী** (৩য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। **বিল্বদল**—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২০। **হালদার বাড়ী**—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (২য়সং-যন্ত্রস্থ)
২১। **মধুপর্ক**—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। **লীলার স্বপ্ন**—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩। **সুখের ঘর** (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ।
২৪। **মধুমল্লী**—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২৫। **রসির ডায়েরী**—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। **ফুলের তোড়া**—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)
২৭। **ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। **সীমন্তিনী**—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। **নব্য-বিজ্ঞান**—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ।
৩০। **নববর্ষের স্বপ্ন**—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। **নীলমাণিক**—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ।
৩২। **হিসাব নিকাশ**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্।
৩৩। **মায়ের প্রসাদ**—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। **ইংরাজী কাব্যকথা**—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ।
৩৫। **জলছবি**—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। **শয়তানের দান**—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। **ব্রাহ্মণ পরিবার**—(২য় সং)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৩৮। **পথে-বিপথে**—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।
৩৯। **হরিশ ভাণ্ডারী** (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
৪০। **কোন্ পথে**—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ।